
আকাশে আগুন
পাতালে আগুন
শিশির কুমার মজুমদার

শিশিরকুমার মজুমদার

৪.৪

আকাশে আগুন পাতালে আগুন

৫৩৯

IPP

ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৫৭সি, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা—৭০০০৭৩

অলংকরণ ঃ
সত্যজিৎ রায়

প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৭৪
প্রথম আই. পি. পি. সংস্করণ—নভেম্বর ১৯৮৬

© শিশিরকুমার মজুমদার

প্রকাশক ঃ
সি, ভট্টাচার্য
ইন্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিমিটেড
৫৭সি, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক ঃ
নিতাই সামন্ত
পুষ্প প্রিন্টার্স
১৫, অনাথ দেব লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

8.09.2010
14038

প্রচ্ছদ ঃ
রাহুল মজুমদার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ
"সন্দেশ" পত্রিকা

মূল্য ঃ ১২·০০

রাণা ও মন্দনমন্দনকে

—জ্যেঠু

লেখকের অন্যান্য বই—

তুফান-দরিয়ার পরাণ মাঝি
শব্দ সিঁড়ি রহস্য
কুঠিবাড়ি রহস্য
দালাং মিসনের ঘণ্টা
সিন্ধুতলের সন্ধানী
পাতালপুরী অভিযান
মামাবাবুর অ্যাডভেঞ্চার
বনে বনান্তে
দাস্তাল (যন্ত্রস্থ)

আকাশে আগুন পাতালে আগুন

॥ এক ॥

বেলা দুপুর গড়িয়ে গেছে। পথ এখনও অনেক বাকি। একটানা এক ঘেয়ে মোটরগাড়ির ঝাঁকানি খেতে খেতে যেন একটু ঝিমুনি এসেছিল অমলের, চোখ দুটো বোধ হয় জুড়েও এসেছিল। হঠাৎ মথুরা ড্রাইভারের ডাক শুনে তন্দ্রা ছুটে গেল—দাদাবাবু।

—উঁ। চোখ চেয়ে অমল সামনের দিকে তাকাল। রাস্তাটা সামনে দুইদিকে ভাগ হয়ে গেছে।

—আমরা কোনদিকে যাব ? জিজ্ঞাসা করল মথুরা ড্রাইভার।

—তাইতো। অমল এপাশ ওপাশ তাকিয়ে জায়গাটাকে চিনতে চেষ্টা করল। না। সব কিছু একদম বদলে গেছে। কাঁচা রাস্তা ছিল এখানে এখন হয়েছে তা পাকা। শুধু তাই নয়, আশ পাশের সব কিছুও কেমন যেন নতুন মনে হচ্ছে। সেই কত বছর আগে এখানে এসেছিল ও। কিছু কি ছাই আর ওর মনে আছে ? তখন ছিল বৃটিশ রাজ আর আজ দেশ হয়েছে স্বাধীন। শুধু কি তাই ? তখন বয়স ছিল ওর বারো কি বড় জোর তেরো। আর এখন···।

—মথুরা বাবু, আপনি মোড়ের মাথায় গাড়ি থামান। একটু চা খাব। আর রাস্তা জেনে নিতে হবে। আমি তো কিছুই চিনতে পারছি না।

গাড়ি একপাশে থামাল মথুরাবাবু। ইঞ্জিন বন্ধ করে নেমে এল। রাস্তার দুপাশ ঘিরে দোকান পাট। হালুইকরের দোকান। চায়ের দোকান। পান বিড়ি সিগারেটের দোকান। দু একটা হয়তো মনিহারি জিনিসের দোকানও আছে। লোক জনের ভিড়।

কেনা বেচা চলছে। এসব তখন কোথায় ছিল? মোটর গাড়ির কথা তখন এখানকার কেউ ভাবতে পারত না। ক্যাঁচ কোঁচ করে দু চারটে গরুর গাড়ি যেত এপথ দিয়ে। খানা গর্তে পড়ে গরুগুলোর কষ্টের সীমা থাকত না। আর আজ সেখানে যাত্রী নিয়ে হুস করে চলে যাচ্ছে বাস। মাল বোঝাই বড় বড় লরিগুলো ছুটছে শহরের দিকে। পথের ধারে দোকানিদের জমাট ব্যবসা।

—আসুন দাদাবাবু। ডাকল মথুরা।

—হ্যাঁ চলুন ঐ সামনের চায়ের দোকানটাতে। বলে এগোল অমল। গাড়ি পথের মাঝে থামতে দেখে এ দোকান ও দোকানের লোকেরা উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল। চায়ের দোকানের সামনে যেতেই দোকানী ডাকল—আসুন বাবু আসুন। ওরে, ও কচে, বেঞ্চিটা ঝেড়ে দিয়ে যা।

যে কয়জন লোক জটলা করছিল তারাও তাদের কথা থামিয়ে অবাক হয়ে ওদের দিকে তাকাল। একটা বেঞ্চের একপাশে বসে পড়ল অমল। ডাকল—মথুরাবাবু আপনিও বসুন। দেরী করবেন না, আসুন।

একটু তফাৎ হয়ে বসল মথুরা ড্রাইভার।

দোকানী জিজ্ঞাসা করল—কি দেব বাবু? ভাল মিষ্টি আছে, দিই? একেবারে টাট্‌কা।

—বেশ তাই দিন। বলল অমল।

একজন বুড়ো মুসলমান দোকানের এক কোণে বসে আপন মনে বিঁড়ি টানছিল। বলল—বাবুদের আজ্ঞে যাওয়া হচ্ছে কোথায় ইদিকে?

—কনকপুর। উত্তর দিল অমল।—আচ্ছা বলতে পারেন কোন রাস্তাটা কনকপুরে গেছে?

—হ্যাঁ আজ্ঞে। এই বাঁয়ের রাস্তাটা। তা আজ্ঞে সেখানে কোন বাড়িতে যাওয়া হচ্ছে?

—চৌধুরীদের বাড়ি।

—চৌধুরীদের বাড়ি! কোন চৌধুরীদের বাড়ি?

—রাজা বলরাম চৌধুরীর বাড়ি।

বিঁড়ি ফেলে মুসলমান বুড়ো উঠে এল।—বলেন কি আজ্ঞে! সে বাড়িতে কোন মনিষ্যি থাকে না। রাজার নাতির ঘরে পুতিরা শুনেছি থাকেন কলকাতায়।

—আপনি কনকপুর চেনেন?

—তা চিনি আজ্ঞে। কাজে কম্মে পেরাই তো যেতে হয় ওদিকে। ও বাড়ি তো এখন সাপখোপের আড্ডা। ভিতর মহল তো প্রায় একেবারে পড়ে গেছে। কেউ কি আর দেখাশুনা করে। শহুরে বাবুদের বাপ পিতেমোর ভিটের মায়া আছে কি? থাকে কি গেল, কে ভাবে?

—বছর কুড়ি বাইশ আগেও তো ওখানে লোক থাকত শুনেছি। বলল অমল।

—হ্যাঁ বাবু, তা থাকত। রাজা সাহেবের ছোট নাতবৌ বেওয়া হয়ে তার অপগণ্ড ছেলেকে নিয়ে এখানে এসে উঠেছিল। মানে আর কি ভাজের ঘরে ঠাঁই হয় নি তার, তাই। ছিলেনও দু তিন বছর। কিন্তু কপাল যার পোড়ে তার সবই খারাপ। ছেলেটা এসে পড়ল মতি মাস্টারের খপ্পরে। অতটুকু দুধের বাছা মার কথা এতটুকুও না ভেবে সোজা স্বদেশীওয়ালা হয়ে গেল! তারপর লাগল যুদ্ধু। উঃ সে কি ভীষণ যুদ্ধু। জাপানী এল এল রব সব দিকে। সরকার বাহাদুর আগাম দেশের ধান চাল কিনে নিয়ে সরিয়ে ফেলল। জাপানীরা এলে যাতে না খেয়ে মরে। আগুন লাগল আনাজে। এল মন্বন্তর। কুকুর ছাগলের মতন মরল মানুষ। স্বদেশীওয়ালারা ক্ষেপে গেল। গান্ধীবাবা নাকি বললেন—দেশকে স্বরাজ করব নইলে মরব। ব্যাস, মতি মাস্টারের কাজ জুটে গেল। তামাম স্কুলের ছেলেদের ক্ষেপিয়ে বোমা বারুদ নিয়ে গা ঢাকা দিল

পদ্মজলার বাঁওরের ধারের গজার জঙ্গলে। চৌধুরীদের সেই ছেলেটাও দলে ছিল। আমিও ছিলাম বাবু। বললে মানবেন না। গোরা সেপাই এসেছিল খবর পেয়ে। দুদিন দুরাত্তির যুদ্ধু চলেছিল ঐ পদ্মজলার বাঁওরে। ছেলেগুলো জান দিয়েছিল, হটে নি বাবু! শুধু মতি মাস্টার যুদ্ধুর শেষে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়েছিল। তার যে অনেক কাজ, অনেক যুদ্ধু তখনও তো বাকি ছিল কিনা। তা বাবু শুনেছি চৌধুরীদের সেই ছেলেটাও ছিল মাস্টারের সঙ্গে। কিন্তু আল্লার মর্জি! শেষ যুদ্ধু আর মতি মাস্টারকে করতে হয়নি। গঞ্জের বাজারের বিনোদ মোক্তার টাকার লোভে ধরিয়ে দিয়েছিল তাকে। তার ফাঁসি হয়ে যায়। ছেলেগুলোর হয় যাবজ্জীবন দণ্ড। আমিও জেলে যাই বাবু। শুধু আমি কেন শোভানের মা আর চৌধুরীদের বেওয়াকেও সরকার বাহাদুর ছাড়ে নি আজ্ঞে! কোমরে দড়ি দিয়ে পেকাশ্যে রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়েছিল। সে আজ কত দিনের কথা। তারপর থেকে কেউ আর ও বাড়িতে থাকেনি কোনদিন। জমিদারী চলে গেছে। আমলা কর্মচারীও কেউ নেই। এখন ঝড় জল হলে দারুস দারুস করে দেয়ালগুলো ভেঙ্গে পড়ে। কত লোক দেয়ালের ইঁট খুলে নিয়ে যায়। আম জাম কঁ্যাটালের গাছ কেটে ফাঁক করে দেয়। ওখানে আপনি কি করতে যাবেন আজ্ঞে?

—আপনিও কি কনকপুরে থাকেন? জিজ্ঞাসা করল অমল।

—না, পাশের গাঁ ছেলিমপুরে থাকি আমি।

—সেলিমপুর! চমকে উঠল অমল—আপনি কি এখন ওদিকেই যাবেন? না অন্য কোন দিকে?

—হ্যাঁ বাড়িই ফিরব। তিনটে চব্বিশের বাস ধরব বলে বসে আছি।

—তাহলে চলুন না আমাদের সঙ্গে। নামিয়ে দিয়ে যাব আপনাকে।

—না না থাক কষ্ট হবে আপনাদের।

—কিসের কষ্ট। গাড়িতে অনেক জায়গা আছে। তাছাড়া আপনি আমাদের রাস্তা চিনিয়ে দেবেন। আর সারা পথ আপনার কাছে সেই যুদ্ধের গল্প শুনব। আসুন আপনি। কোন কষ্ট হবে না আমাদের।

—তা যা বলেন আজ্ঞে।

চা জলখাবার শেষ করে দাম মিটিয়ে দিল অমল। মথুরা ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিল। পিছনের সিটের দরজা খুলে অমল বুড়োকে বসাল যত্ন করে। তারপর নিজে উঠে বসে গাড়ি ছাড়তে বলল। সেলিমপুর! সেলিমপুর! সেলিমপুরের শোভান আলির বাড়িটা কি চেনে বুড়ো? শোভান আলির আম্মাজান কি এখনও বেঁচে আছে? কে জানে! গাড়িটা বড় আস্তে চলছে যেন।

—তা বাবু, কই বললেন না তো আপনি কেন যাচ্ছেন সে দেশে। বুড়ো মুসলমান আবারও একটা বিঁড়ি ধরিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

—এই এমনি দেশ দেখতে।

—ওটা কাজের কথা হল না আজ্ঞে। দেশ দেখতে সবাই হিল্লী দিল্লী যায়। এ পোড়া দেশে কে আসে।

—আসে আসে। অনেকেই আসে। কেমন হয়ে যেন বলল অমল—আপনি জানেন বড়মিঁয়া অনেকের কাছে এদেশেই তীর্থ। আমার কাছেও তাই।

অবাক বুড়ো বড়বড় চোখ মেলে তাকাল অমলের দিকে। —বুঝলাম না তো আজ্ঞে।

—আমি চৌধুরী বাড়িরই ছেলে। বলল অমল।

—ও তাই বলুন। এতদিন পরে দেশ গাঁয়ের কথা মনে পড়েছে

আপনাদের! তা কি আছে আর দেশের। কি দেখতে এলেন আপনি?

অমল এ কথার কোন উত্তর দিল না। বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল।

দেশের কথা কি আজই প্রথম ওর মনে পড়েছে! না। না। এ দেশ এ গাঁয়ের কথা জীবনের প্রতিটি ক্ষণই ওর মনে পড়েছে। সেই কবে কোন অতীতের এক সন্ধ্যায় গরুর গাড়ি চেপে মার সঙ্গে এসেছিল অমল এই গাঁয়ে। সেদিনটার কথা আজও মনে পড়ে অমলের। শহুরে ছেলে নিরুপায় হয়ে এসেছিল একটু আশ্রয়ের আশায়। আশ্রয় জুটেছিল ওর। তারপর কত কি ঘটে গিয়েছে। প্রতিদিন প্রতিক্ষণ কনকপুরের কথা ওর মনের গভীরে কত ব্যথা আনন্দের ঝড় তুলেছে। আজ এসেছে ও সে ব্যথা সে আনন্দের সঙ্গে নতুন করে মুখোমুখি দাঁড়াবে বলে।

—ঐ যে আম কঁ্যাটালের বাগানটা দেখছেন বাবু। ওখানেই ছিল ছোট কালীকাপুর গেরাম। স্বদেশী যুদ্ধের সময় ও গেরামটা জ্বালিয়ে দিয়েছিল সরকার বাহাদুর। মতি মাস্টারের বাড়ি ছিল কিনা এ গাঁয়েই।

—গাড়ি থামান তো মথুরাবাবু! বলল অমল—আমি একটু নামব এখানে।

—সে গেরাম তো আর নেই আজ্ঞে। কি দেখবেন এখানে? জিজ্ঞাসা করল বুড়ো মুসলমান।

—আসুন আপনি। মতি মাস্টারের বাড়ি কোথায় ছিল, জায়গাটা দেখিয়ে দেবেন আমাকে।

অবাক বুড়ো নেবে এল রাস্তায়—সে কি আর এখন বোঝা যাবে আজ্ঞে? কে মনে রেখেছে কোথায় ছিল মাস্টারের বাড়ি!

পায়ে পায়ে ওরা এগিয়ে গেল আম বাগানের ধারে।

বৃষ্টির জলে ধোয়া এবড়ো খেবড়ো কাঁচা ভিটের ঢিপি চারি-পাশে। কত লোকের সুখ দুঃখের স্মৃতি জড়ানো। কে জানে এর মধ্যে কোনটা মতি মাস্টারের ভিটে? চুপ করে ঢিপিগুলোর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অমল। বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠল ওর। চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল।

—কে তুই? কানের কাছে কে যেন বলে উঠলেন—হ্যাঁরে শোভান, একে আনলি কোথা থেকে?

—আজ্ঞে স্যার। এ চৌধুরী বাড়ির ছেলে। কদিন হল শহর থেকে গাঁয়ে এসেছে।

—তা এখানে আনলি কেন তুই ওকে?

—ও খুব ভাল ছেলে স্যার। ছুটি ফুরুলেই আমদের স্কুলে ভর্তি হবে।

—ভাল ছেলে দিয়ে আমার কি হবে? আমি চাই ডাকা-বুকো, মরতে যারা ভয় পায় না। এমন ছেলে। ঠিক তোর মতন। যা ওকে বাড়ি দিয়ে আয়।

চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এল অমলের।

—আসুন আজ্ঞে। ডাকল বুড়ো—এসব পোড়ো ভিটেয় তেনা-দের বড় ভয়। বেলাও পড়ে এসেছে, পথও এখন ঢের বাকি! আসুন আজ্ঞে!

ঝুঁকে পড়ে মাটিতে হাত দিয়ে সে হাত কপালে ঠেকাল অমল। মনে মনে বলল—স্যার, আমি হয়তো ডাকাবুকো নই। কিন্তু আমি মরতে ভয় পাইনি স্যার। আমি কথা রেখেছি স্যার! আমি কথা রেখেছি!

—ও মাটি কপালে ঠেকালেন আপনি! অবাক বুড়ো বলল—আপনাকে কি তবে চিনতে পেরেছি আমি! কে আপনি? চৌধুরীদের সেই ফুটফুটে ছেলেটা? যার যাবজ্জীবন দণ্ড হয়েছিল। আপনি কি সে?

—কি আসে যায় তাতে আর আজ ? হাসতে চেষ্টা করে অমল, বলল—চলুন ফিরি।

—দাঁড়াও বাবা। পথের মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বুড়ো। —আমার এ ছানি পড়া চোখ দুটো দিয়ে তোমাকে একবার ভাল করে দেখি। আমি ছোলেমান মিয়া আমি তোমাকে চিনতে পারব না ? ইয়া আল্লা ! তুমিই আমার সেই বাপজান ! ঠিক চিনেছি আমি ! ঠিক চিনেছি !



—তুমিই সুলেমান চাচা? চেঁচিয়ে উঠল অমল—আমিতো চিনতেই পারিনি। একি চেহারা হয়েছে তোমার?

—আর চেহারা! হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সুলেমান চাচা। —এতদিন পরে ঘরে ফিরলি বাপজান আয় বুকে আয়।

অমলকে বুড়ো ছুহাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। অনেক কষ্টে কান্না থামিয়ে বলল—মনে পড়ে তোর, বাপজান, সে বছর রসুলপুরের ঈদের মেলা দেখতে গিয়ে ঝড়ের মধ্যি পড়েছিলাম আমরা। ভয় পেয়ে তুই এমনি করে আমার বুকের মধ্যিখানটাতে লুকিয়েছিলি। মনে পড়ে?

মাথা নাড়ল অমল—হ্যাঁ মনে পড়ে চাচা। মনে পড়ে আরও কত কথা। কতদিনের কথা···

বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। চৌধুরী বংশের ছোট ছেলে বিমল চৌধুরী। সাল ১৯৪০। ক্লাস সেভেনের ফাইনাল পরীক্ষা তখন সবে শেষ হয়েছে। ধুমধাম করে শ্রাদ্ধ চুকতে না চুকতেই মেজজ্যাঠা বড়জ্যাঠা শুরু করেছিলেন তাদের জমিদারী চাল। সে চাল বুঝবার মত বয়স তখন অবশ্য অমলের হয়নি। শুধু দেখত রাতের অন্ধকারে একলা ঘরে মা ওর কাঁদতেন। ঠাকুরের ছবির সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতেন। চুপি চুপি কতদিন জিজ্ঞাসা করেছে অমল—কেন কাঁদ মা? কোন জবাব পায়নি তার। বড়জ্যাঠা মেজজ্যাঠা লোক ভাল নয়। কেমন করে সে কথা যেন ও বুঝতে পারত। তেমনি খারাপ বড়জেঠিমা মেজজেঠিমা। ঝিয়ের মত মাকে খাটাত রাত দিন। খেতে দিত না পেট ভরে।

কতদিন বলেছে অমল—চল না মা আমরা অন্য কোথাও চলে যাই। সেখানে শুধু তুমি আর আমি থাকব।

মা ওর কথা শুনে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে হাসতেন। সে হাসি কান্নার চেয়েও খারাপ।

শেষ পর্যন্ত বড়জ্যাঠা একদিন ওর মাকে ডেকে পাঠালেন। মা একমাথা ঘোমটা টেনে এসে দাঁড়ালেন দরজার আড়ালে। বড়জ্যাঠা বললেন—অনেক ভেবে দেখলাম বৌমা। তোমার আর এখানে থাকা হবে না। তুমি কনকপুরে যাও। সেখানকার যা আদায় তহসিল, তাতে তোমার অংশে তোমাদের বেশ ভালভাবেই চলে যাবে। খোকার পড়াশুনার কথা যদি বল তো বলব, গাঁয়েও তো হাইস্কুল আছে। সেখানে ভর্তি করে দিও ওকে। হবার হলে তাতেই হবে। তোমাকে নিয়েই এবাড়ির সবার শান্তি যেতে বসেছে। এতে সবার মঙ্গল। আমি সাতকড়ি মুখুজ্জেকে লিখে দিচ্ছি। সে নিজে যেন স্টেশনে হাজির থেকে তোমাদের নিয়ে যায়।

এসব কথার মা কোনো উত্তর দেন নি। তাঁর কথা কে শুনবে? কনকপুর কোথায় তা অমল জানত না। তবুও ও খুব খুসি হয়েছিল। আর যাই হোক সেখানে তো আর বড়জেঠি মেজজেঠি থাকবে না। মাকেও আর রাত দিন খেটে মরতে হবে না। এর বেশি বোঝার মতন বয়স তখন অমলের হয় নি।

রাত্রিবেলা মার কোলের কাছে শুয়ে ও বলেছিল—এই বেশ ভাল হল মা। তুমি আর আমি থাকবো। কেউ আর আমাদের কিছু বলতে আসবে না।

—তোর পড়াশুনার কি হবে? মা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

—কেন? সেখানকার স্কুলে পড়ব।

—সে তো গাঁ, পাড়াগাঁ দেশ। কেমন স্কুল কে জানে। তোর জন্যই আমার যত ভাবনা, খোকা!

—কিচ্ছু ভেব না মা। তুমি দেখ, আমি খুব মন দিয়ে পড়াশুনা করব।

—শহর ছেড়ে গাঁয়ে গিয়ে তুই থাকতে পারবি? মা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

—হুঁ। তুমি যেখানে থাকবে সেখানে কেন থাকতে পারব না?

আর সেখানে তো কেউ তোমাকে খাটাতে আসবে না। একটু ভেবে বলেছিল অমল—আমরা কবে যাব মা?

—জানি না তোর জেঠুরা কবে আমাদের তাড়াবে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা উত্তর দিয়েছিলেন।

প্রথমে কথা হয়েছিল বড় জেঠুর বড়ছেলে সুজন সঙ্গে গিয়ে ওদের পৌঁছে দিয়ে আসবে। কিন্তু কি কারণে যেন তাও হল না। শেষ পর্যন্ত একদিন সকালবেলা বাক্স বিছানা বেঁধে সবাইকে প্রণাম করে ওরা উঠল ঘোড়ার গাড়িতে। সঙ্গে চলল নায়েবমশাই স্টেশন অবধি পৌঁছে দিয়ে আসতে। মার চোখ ছুটো ছল ছল করে উঠেছিল, দেখেছিল অমল। কিন্তু ওর বেশ ভালই লাগছিল। কখন রেল গাড়িতে উঠবে এ চিন্তাটাই ওকে পেয়ে বসেছিল। কোন দিন ত ও রেলে চড়েনি। স্টেশনে এসে অবাক হয়ে গিয়েছিল ও! বাপরে, এসব কি কাণ্ড। নায়েবমশাই টিকিট কেটে ওদের গাড়িতে বসিয়ে দিয়েছিল। কত লোকের ভিড় সে গাড়িতে। কত রকমের কথাই না তারা বলছিল। মালপত্র গুছিয়ে দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিল নায়েবমশাই। বলেছিল—পৌঁছে চিঠি দেবেন ছোট মা। সাবধানে যাবেন। বেলা আড়াইটার সময় গাড়ি পৌঁছাবে মামুদপুর স্টেশনে। সাতকড়ি বাবু হাজির থাকবেন চিঠি দিয়েছেন। সেখানেই নামবেন।

এসব কথার উত্তরে মা শুধু মাথা নেড়েছিলেন। তারপর ঘণ্টা পড়েছিল। ভীষণ শব্দ করে বাঁশী বেজে উঠেছিল আর সারা রেল গাড়িটা ছুলতে শুরু করেছিল। একটু ভয় পেয়েছিল অমল প্রথমে, কিন্তু যখন দেখল গাড়িটা চলতে শুরু করেছে তখন ভয় ভেঙ্গে গিয়ে ও অবাক হয়েছিল!

—নমস্কার ছোট মা। নায়েবমশাই চেঁচিয়ে বলেছিল।

গাড়ি তখন ছুটতে সুরু করেছে। অবাক হয়ে অমল দেখেছিল মার ছুচোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে!

মা কেন কাঁদছে? মার কি রেলে চড়তে ভাল লাগে না? কিছু

জিজ্ঞাসা করেনি অমল। সময় ছিল না ওর। রেলে চড়া যে এত মজার তাতো জানত না ও। কত দেশ গাঁ শহর পেরিয়ে ছুটে চলেছে রেলটা। মাঝে মাঝে থামছে স্টেশনে। লোক উঠছে নামছে। আবার ছুটছে রেলগাড়ি। ঝমঝমিয়ে উঠছে নদীর ব্রীজের উপরে। হুস্ করে পার হয়ে যাচ্ছে নদী।

দেখতে দেখতে বেলা পড়ে এল। পাশের এক বুড়ো ভদ্রলোককে মা জিজ্ঞাসা করলেন—মামুদপুর কত দূরে বাবা। আমরা সেখানেই নামব।

—মামুদপুর ? দাঁড়ান দেখছি। ভদ্রলোক তার হাতের বইটার পাতা উল্টে যেন কি সব দেখলেন, তারপর বললেন—এর পরেই আসছে ইদলপুর। তারপরে মামুদপুর। আর বেশি দেরি নেই মা। আপনার মালপত্র সব গুছিয়ে নিন।

—আমাকে একটু নামতে সাহায্য করবেন ? মা অসহায়ের মতন বললেন।

—নিশ্চয় মা। নিশ্চয়। বললেন বুড়ো ভদ্রলোক।

আর বেশী দেরি নেই শুনে মন খারাপ হয়ে গেল অমলের। কেন মামুদপুর আরও দূরে হলে ক্ষতি হত কি ? আর কি কোনো দিনও রেলে চড়তে পারবে ও। ভয়ানক রাগ হল ওর যেন কার উপরে।

মা ডাকলেন—খোকা কাছে এসে বস। আমাদের এবারে নামতে হবে। গাড়ি তখন একটা স্টেশনে এসে থেমেছে।

মামুদপুর আসতেই বুড়ো ভদ্রলোক গাড়ির আরও কজনকে ডেকে ওদের বাক্স বিছানা সব নিচে নাবিয়ে দিলেন। মা কি যেন বললেন, শুনে ভদ্রলোক বললেন—তাতে কি হয়েছে, তাতে কি হয়েছে।

স্টেশনে নেবে অমলের মন খারাপ হয়ে গেল। দূর ছাই, এটা আবার একটা স্টেশন নাকি। চার পাঁচ জন লোক এদিকে ওদিকে ঘুরছে। মাথার উপরে ছাদ নেই। মা তখন অসহায়ের মত এদিকে ওদিক চাইছিলেন। এমন সময়ে রোগা মতন একটা লোক ছুটতে ছুটতে

এসে সামনে দাঁড়িয়ে মস্ত একটা সেলাম ঠুকল—আজ্ঞে মাঠান, আপনারাই তো কলকাতা থেকে এলেন?

—হ্যাঁ বাবা।

—কনকপুরের চৌধুরী বাড়ি যাবেন তো?

—হ্যাঁ বাবা।

—চলেন আজ্ঞে। গাড়ি তৈয়ার আছে।

মা বললেন—তোমাকে তো চিনলাম না বাবা। নায়েবমশাই আসেন নি?

—আজ্ঞে এসেছেন। উনি হাটের দোকানে টচ্‌বাত্তির মশলা কিনতে গেছেন। গাড়ির দেরি হয়েছে খুব। পৌঁছাতে আমাদের রাত হয়ে যাবে মাঠান।

—তোমার নাম কি, বাবা?

—আমি আজ্ঞে আপনাদের পাইক, ছলেমান মিয়া। গাঁ পাড়াগাঁ দেশ পথ ঘাট ভাল নয় তেমন। তাই আজ্ঞে আমিও এসেছি। যদি বিপদ ঘটে।

সুলেমান মিয়া বাক্স বিছানা আলাদা করে বাক্সটা মাথায় তুলে নিয়ে ছুটতে শুরু করে দিল।

ব্যস্ত হয়ে মা বললেন—ওরে খোকা দেখ দেখ, লোকটা কোথায় যায়। ওকে আমি তো চিনিনা একদম।

লোকটা ততক্ষণে ফটক দিয়ে বাইরে বার হয়ে গেছে। কোন কথা না ভেবেই অমলও ছুটল সেই দিকে। গেটে কে যেন জিজ্ঞাসা করল —খোকা টিকিট?

—মার কাছে। বলে সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড় করে রাস্তায় নেবেই দেখল ও সামনে দুখানা গরুর গাড়ি কাত হয়ে রয়েছে, তার একটাতে মাথার বাক্সটা নামিয়ে রাখছে লোকটা।

সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটা বলল—আরে বাপজান তুমি ছুট্টে এলে একলাটি, মাঠান কই? তেনারে কি একলা রেখে আসতে আছে? চল চল। বলেই লোকটা বড় বড় পা ফেলে এগোল।

পিছন পিছন ছুটল অমল।

বিছানাটা একটানে মাথায় তুলে বাকি জিনিসগুলো হাতে ঝুলিয়ে নিল লোকটা—আসেন আজ্ঞে মাঠান। গাড়িতে বসে একটু জিরিয়ে নেবেন। নায়েবমশাই এক্খুনি এসে পড়লেন বলে।

মা আর কোন কথা না বলেই এগোলেন।

গাড়িতে পুরু করে খড় বিছানো, তার উপরে কম্বল পাতা। মার পিছন পিছন ছইএর ভিতরে উঠে বসতেই সুলেমান হাঁকল—ও পরাণে ভাই, গাড়িতে বয়েল জোতো শীগগির। মাঠানকে একটু আরাম করে বসতি দাও। যা ধকল গেছে তেনাদের টেরেনে।

একটা কালো মতন লোক দুটো গরু এনে গাড়িতে লাগিয়ে দিল। একটু নড়ে চড়ে আরাম করে বসে অমল বলল—বেশ লাগছে, না মা?

দুহাত কপালে ঠেকিয়ে মা বললেন—নারায়ণ জানেন।

বাইরে সুলেমানের গলা শোনা গেল—নায়েবমশায়ের ঐ বড় দোষ নড়তে চড়তে ছমাস। এতটা পথ সামনে, সে হুঁস কি আছে তেনার। সঙ্গে একটা দুধের বাচ্ছা। ক্ষিদে তেষ্টাও তো আছে মানুষের।

এর কিছুক্ষণ পরেই এলেন নায়েব সাতকড়ি মুখুজ্জে। গাড়ির সামনে এসে দুহাত জোড় করে ঝুঁকে প্রণাম করলেন মাকে—আমি সাতকড়ি মুখুজ্জে মা, আপনাদের নায়েব! পথে কষ্ট হয় নি তো মা?

মুখের ঘোমটা সরিয়ে একবার তাকে দেখে নিলেন মা। তারপর খুব শান্ত ভাবে বললেন—না।

—আমরা তাহলে এবারে যাত্রা শুরু করতে পারি?

—আস্তে মাথা নাড়লেন মা।

—ওরে গাড়ি তোল। আর দেরি করিস না।

তারপরেই ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ তুলে দুলে দুলে গাড়িগুলো চলতে শুরু করল। গরুর গাড়ি রেল গাড়ি নয়। তবুও এমন করে যেতেও তো ভাল লাগে খুব! কলকাতার থেকে এসব জায়গা তবে কিসের খারাপ? কলকাতায় তো এসব কিছুই নেই।

॥ দুই ॥

সবার আগে হুই হুই করতে করতে পায়ে হেঁটে চলেছে সুলেমান। হাতে তার ইয়া মস্ত একটা লাঠি। তার পরেই অমলদের গাড়ি। সবার শেষে বেশ কিছুটা দূরে বাক্স বিছানার গাড়ি। তারই উপরে বসে আছেন নায়েবমশাই। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে।

বেশ কিছুটা এগিয়ে এসে হাটতলা। সেখানে লোকজনদের ভিড়। শেষ বেলায় কেনা বেচা করছে। গরুর গাড়ির চাকার আওয়াজ শুনে অনেকেই মুখ তুলে তাকাচ্ছে। কে যায় এত বেলায়।

একটু যেন ঘুম এসে গেছিল অমলের। বাইরে হঠাৎ সুলেমান চেঁচিয়ে উঠল—ও বাপজান তোমার সাড়া পাইনা কেন? দেখ দেখ আমরা কোথায় এসে গিইছি।

তন্দ্রা ছুটে গেল অমলের। চোখ রগড়ে সামনে তাকাতেই দেখল পথটা বেঁকে চলে গিয়েছে একটা জংলা জায়গার পাশ দিয়ে। ও ভেবেছিল বোধ হয় জঙ্গল। ভাল করে তাকিয়ে দেখল, জঙ্গল নয়, বড় বড় গাছের বাগান। তার পরেই একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে। এমন বাড়ি ঘর ও আর এর আগে দেখেনি। গাড়িটা বাগানটাকে বেড় দিয়ে আরও একটু এগোতেই দেখল পথের ধারে একপাল ছেলে মেয়ে খেলা করছে। গাড়ি দেখে ওরা খেলা ফেলে অবাক হয়ে তাকাল।

—কি গো বাপজান সাড়া নেই কেন তোমার? ঘুমুলে নাকি আবার? চেঁচিয়ে উঠল সুলেমান।

মা বললেন—হ্যাঁরে খোকা, সাড়া দিচ্ছিস না কেন? ও যে তোকেই ডাকছে।

—আমার নাম কি বাপজান নাকি ? অবাক হয়ে বলল অমল। --আমি বুঝব কি করে ও আমাকে ডাকছে ?

মা হেসে বললেন—ও মুসলমান, আদর করে ও তোকে বাপজান বলে ডাকছে।

—কি বলছ তুমি ? চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল অমল।

—আমরা ছোট কালীকাপুর গেরামে এসে গেইছি। উত্তর দিল সুলেমান।—জান বাপজান আমার দাদার কাছে শুনেছি, সে যুগে এ গাঁয়ে এক ভীষণ ডাকাত থাকত। তার পিতিষ্ঠে করা মা কালীর মন্দির আছে গাঁয়ের ভিতরে। মানুষ বলি হত! তখন কি এমন করে এখান দিয়ে জন মনিষ্যি যেতে পারত! মেরে ধরে সব কেড়ে নিত ডাকাতটা। আজকাল সরকারবাহাদুরের আমলে আর সে ভয় নেই। এখন গাঁয়ে থাকে আমাদের ইস্কুলের ছোট মাস্টর! মতি মাস্টর। বড় ভাল মানুষটা। তার ইস্কুলেই তো তুমি পড়বে গো।

অমল বলল—আগে যাই গ্রামে তবে তো।

—সে তো নিশ্চয়। বলল সুলেমান।—তবে নায়েবমশাই বড় মাস্টরকে বলে সব ব্যবস্তাই পাকা করে রেখেছেন।

এর কিছু পরেই সন্ধ্যে নেমে এল। পথের ধারেও একটু একটু করে কুয়াশা জমতে শুরু করে দিল। গাড়ির গাড়োয়ান গাড়ি থামিয়ে একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে গাড়ির নিচে বেঁধে দিল। সে আলোতে পথের সামনের কিছু দূর পর্যন্ত দেখা যেতে লাগল। চার পাশের আর সবই অন্ধকারে ডুবে গেল। অন্ধকার যে এত ভীষণ হয় সে ধারণা অমলের ছিল না। কেমন যেন ওর ভয় করতে লাগল। গ্রামেও কি এমন অন্ধকার নাকি ? এত অন্ধকারে ওরা থাকবে কেমন করে। হঠাৎ খেয়াল হল ওর। গরুর গাড়ির চাকার আওয়াজ ছাড়া সারা দুনিয়ার কোথাও যেন আর কোনো শব্দই নেই। মাঝে মধ্যে যদিও কোথাও এক একটা ঝিঁঝির ডাক শোনা

যাচ্ছে। সে ডাকও অত বড় ধূ ধূ মাঠের মাঝখানে কোন শব্দই বলে মনে হচ্ছে না!

হঠাৎ কখন যেন ওর শীত শীত করতে লাগল। ভিজে ভিজে হাওয়াও আসছে যেন। সে হাওয়ার গন্ধও যেন কেমন অন্য রকম। ঢালু পথ পেয়ে গরু দুটোও যেন তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরে চলতে শুরু করে দিল।

মা বললেন—ওরে খোকা, চাদর ভাল করে মুড়ি দিয়ে বোস। ঠাণ্ডা লাগাসনে যেন।

—আর কত দূর মা? অমল জিজ্ঞাসা করল।

—আমি কি ছাই আর এসব পথ চিনি। সেই কবে এসেছিলাম। এসে গিয়েছি বোধ হয়।

বাইরে থেকে সুলেমান আবারও চেঁচিয়ে উঠল—ও বাপজান। আমারা পদ্মবাঁওরের কাছে এসে গিইছি। আঁধারে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, নইলে তুমি দেখতে পেতে বাঁ দিকে যত দূর নজর চলে, জল জল!

—কোথায় কোথায়? উৎসাহে অমল এগিয়ে গিয়ে ছইয়ের বাইরে মুখ বাড়াল।

—এ আঁধারে কি কিচ্ছু দেখাবে এখন!

মা ব্যস্ত হয়ে বললেন—ওরে খোকা, অমন করে ঝুঁকিস নে। পড়ে যাবি।

—কিচ্ছুই যে আমি দেখতে পেলাম না!

—না, মুখ বাড়িও না। শুনেছি পদ্মজলার এ পারেই গজার জঙ্গল। বাঘ থাকে।

—আমি যে কিচ্ছুই দেখতে পাচ্ছি না। অস্থির হয়ে অমল আবার বলল।

—দেখে কাজ নেই, বস ঠিক হয়ে। ধমকে উঠলেন মা।

সুলেমান বলল—ভয় পাবেন না, মাঠান। সে দিনকাল আর

নেই। কোম্পানীর সাহেবরা সব বাঘ মেরে দিয়েছে। তবে হ্যাঁ, রাতে যাদের নাম করতে নেই, এ জঙ্গলে তাদের বড় উপদ্রব। এই আলো আর চাকার আওয়াজে তারাও সব পথ থেকে নেমে গিয়েছে।

—তারা কারা? থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল অমল।

—শোন কথা! রাতে কি তাদের নাম করতে আছে? তবে তুমি ভেব না বাপজান। থির হয়ে দুদিন আগে জিরিয়ে নাও আমিই না হয় তোমাকে একদিন এদিকটা সব দেখিয়ে নিয়ে যাব। নয়তো তোমাদের মতিমাস্টর, তার ছাইকেলে চড়েও আসতে পারো। সে হবে খন পরে। আগে তো গাঁয়ে গিয়ে বস থির হয়ে।

এর কিছুক্ষণ পরেই মার কোলে মাথা রেখে অমল ঘুমিয়ে পড়েছিল। অনেক রাতে গাঁয়ে পৌঁছেছিল ওরা।

বাড়ি যে এত বড় হতে পারে তাও জানত না অমল। প্রথম প্রথম অবাক হত ও। গাঁয়ের লোকেরা বলে রাজবাড়ি! ঘরের পর ঘর তার পরেও ঘর। মাঝে মাঝে মস্ত বড় সব উঠান। আর বড় বড় থামওয়ালা লম্বা বারান্দা। কত লোক থাকত এখানে! রূপকথার রাজবাড়িও কি এমনি বড় হয়? এক পাশের দুখানা একতলার ঘর নায়েবখুড়োই খুলে দিয়েছেন। সেখানেই থাকে ওরা। নায়েবখুড়ো দোতলার বড় ঘরই খুলে দিতে চেয়েছিলেন। মা রাজি হননি। এত বড় বাড়িতে একলা একপাশে পড়ে থাকা অসম্ভব। ওদের ঘরের সামনেই লম্বা একটা বারান্দা তার পরেই নায়েবখুড়োর কাছারী। বড় চৌকির উপরে ময়লা ফরাস পাতা। তার উপরে ডেস্কের সামনে বসে থাকেন উনি। সারাদিন নানান লোকের আনাগোনা। নানান কাজ তাঁর। ঘরের দরজার সামনে বারান্দায় বড় বেঞ্চ পাতা। সেখানেই বসে থাকে সুলেমান। তারও অনেক কাজ।

সুলেমান কিন্তু ভিতরে আসে না। কেন যে আসে না তা বোঝে না অমল। বড় ভাল মানুষ সুলেমান। বেলা পড়ে এলেই বারান্দার নিচে থেকে হাঁক দেয়।

—কই গো বাপজান চল তোমাকে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসি। আর তো ক'দিন পরেই ইস্কুলে যেতে হবে। তখন কি আর গাঁ বেড়ানোর সময় হবে তোমার!

পথে বের হয়ে সুলেমান কত মজার গল্প বলে। ডাকাতের গল্প। পরীর গল্প। তার থেকেও ভাল বলে ও ওর দাদার দোনলা বন্দুক দিয়ে ভীষণ ভীষণ সব জন্তু মারার গল্প। সে সব গল্প শুনে হাসি পায় অমলের। যখন সুলেমান হাতমুখ নেড়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলে কেমন করে ওর দাদা কনকপুরের জঙ্গলে দু দুটো ভয়ংকর সিংহকে মেরেছিল। তখন আর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করে না অমলের! কিন্তু মার কড়া হুকুম সন্ধ্যের আগেই ফিরতে হবে। আর সে হুকুম অমান্য করে এমন লোক সুলেমান নয়।

একদিন ওরা বেড়িয়ে ফিরছে। এমন সময়ে অমল দেখতে পেল একটু দূরেই গেঁয়ো পথ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে কে যেন ওদের দিকেই আসছেন। এমন গাঁয়ে সাইকেল! কাঁচা পথ দিয়ে সাইকেল ঝকর ঝকর করতে করতে ওদের সামনে এসে থামল। সাইকেল থেমে নেমে এক ভদ্রলোক ওদের সামনে দাঁড়ালেন।

—এ ছেলেটি কে হে সুলেমান। একে তো এ গাঁয়ে এর আগে দেখিনি? জিজ্ঞাসা করলেন ভদ্রলোক।

—প্রণাম হইগো ছোট মাষ্টারমশাই। এটি আমাদের ছোটকর্তার ছেলে। কদিন হল গাঁয়ে এয়েচেন।

—ও হ্যাঁ, শুনেছিলাম বটে ছোটকর্তামা আসছেন। তা হ্যাঁ হে খোকা, তোমরা কি এখানেই থাকবে, না আবার ফিরে যাবে কলকাতায়? জিজ্ঞাসা করলেন উনি।

—আমরা এখন এখানেই থাকব। বলল অমল।

—তাই নাকি! তা তোমার পড়াশুনার হবে কি?

—আমি এখানকার স্কুলেই ভর্তি হব।

—তা বেশ বেশ! কোন ক্লাসে পড় তুমি?

—আমি ক্লাস সেভেনের পরীক্ষা দিয়ে এসেছি। এখানে ক্লাস এইটে ভর্তি হব।

—ভাল ভাল। তা দেরি করছ কেন তাড়াতাড়ি ভর্তি হয়ে যাও। আর তো কদিন পরেই স্কুল খুলে যাবে।

—আমি মাকে বলব। বলল অমল।

—হ্যাঁ বোলো। আমার নমস্কার জানিও তোমার মাকে।

—আপনি এদিকে কোথায় যাচ্ছেন গো মাষ্টারমশাই? জিজ্ঞাসা করল সুলেমান।

—যাচ্ছি একবার তোমাদের সেলিমপুরের দিকেই। শুনলাম, শোভানের আম্মাজানের আবার নাকি কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে। দেখে আসি গিয়ে। ম্যালেরিয়া মনে হচ্ছে। ওষুধ নিয়ে যাচ্ছি, দিয়ে আসব গিয়ে।

—আজ ঘরে ফিরবেন নি? জিজ্ঞাসা করল সুলেমান।

—দেখি বেশি রাত হলে আজ আর ফিরব না, ওখানেই থেকে যাব। বলে আবার সাইকেলে চড়ে বসলেন উনি—যাও তোমরাও যাও। বেলা পড়ে এসেছে। বাইরের হিমে আর ছেলেটাকে বেশি ঘুরিও না। ওর ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

ভদ্রলোক চলে যেতেই সুলেমান বলল—আমাদের মতিমাষ্টার গো বাপজান। মানুষটা বড় ভাল গো। গরীব দুঃখীর প্রাণ। তা হ্যাঁ গো বাপজান? মাষ্টার যা বলে গেল তা তুমি মাঠানকে বোলো কিন্তু। ঐ যে ইস্কুলে ভর্তি হবার কথাটা।

বেড়িয়ে ফিরেই অমল মাকে বলল—মা, আজ স্কুলের ছোটমাষ্টার-মশাই-এর সঙ্গে পথে দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে তাড়াতাড়ি স্কুলে ভর্তি হতে বলেছেন। তুমি নায়েবখুড়োকে বলে দাও না। আমি কালই স্কুলে ভর্তি হব।

মা কোথায় যেন কি একটা কাজে যাচ্ছিলেন। অমলের কথা শুনে দাঁড়ালেন, বললেন—আচ্ছা খোকা, একটা কথা ঠিক করে

বলতো। এ গাঁয়ে তুই থাকতে পারবি তো ? না দুদিন পরেই হাঁপিয়ে উঠবি ?

—একথা কেন বলছ মা ? অবাক হয়ে অমল জিজ্ঞাসা করল।

—আমি অনেক ভেবে দেখেছি। তোর ভাল না লাগলে আমি এখানে কিছুতেই থাকব না। তাতে যা হয় হবে। তোর লেখা পড়ার জন্য আমি নয় কলকাতায় গিয়ে পরের বাড়িতে দাসীবৃত্তি করব। দুটো পেট চলে যাবে কোন মতে। তুই ভাল করে ভেবে বল।

রাগ করে অমল বলল—কেন মা এসব কথা বলছ, তুমি দাসীবৃত্তি করবে কেন ? আমি এখানেই থাকব। এখানকার স্কুলে পড়ব। তুমি শুধু নায়েবখুড়োকে বলে দাও।

মা দু পা এগিয়ে এসে ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। আদর করে ওর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—যা তাহলে এখনিই নায়েব-খুড়োকে ডেকে আন। আমি বলে দিচ্ছি।

একছুটে অমল একেবারে কাছারী ঘরের মধ্যে এসে থামল। ঘরে তখন সুলেমান হারিকেন জ্বেলে দিয়ে গেছে। সে আলোতে মাথা নিচু করে বসে নায়েবখুড়ো মোটা একটা খাতায় কি যেন সব লিখছিলেন। ওর পায়ের আওয়াজ শুনে মুখ তুলে তাকালেন তিনি।

—মা আপনাকে এখনি একবার ডাকছেন।

—আমাকে ? আচ্ছা চল যাচ্ছি। খাতা গুটিয়ে রেখে নায়েবখুড়ো চৌকি থেকে নামলেন—কেন ডাকছেন বলতো ? চটি পায়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

—আমাকে স্কুলে ভর্তি করার কথা বলতে।

—ও আচ্ছা, চল। চটি ফটফট করতে করতে তিনি এগোলেন অমলের পিছন পিছন।

পরদিন সকাল বেলা মাকে প্রণাম করে নায়েবখুড়োর সঙ্গে অমল চলল স্কুলে ভর্তি হতে।

স্কুল বাড়িটা পুরনো, সামনে অনেকটা খেলার মাঠ। সে মাঠ পার হয়ে ওরা স্কুল দালানে উঠল।

অফিস ঘরের সামনে এসে দেখা হয়ে গেল ছোট মাষ্টারমশাই-এর সঙ্গে। উনি তখন কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। বললেন—এই যে নায়েব-মশাই, খোকাকে ভর্তি করতে নিয়ে এলেন বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। উত্তর দিলেন নায়েবখুড়ো। হেডমাষ্টারমশাই আছেন তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। যান ভিতরে যান। বলে ছোটমাষ্টার চলে গেলেন।

—এসো তুমি আমার সঙ্গে। ডাকলেন নায়েবখুড়ো।

হেডমাষ্টারমশাইয়ের মুখ ভরা পাকা দাড়ি। গলাবন্ধ কোট পরে তিনি কি যেন সব কাগজ পত্র দেখছিলেন। ওদের পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকালেন। অমল তাড়াতাড়ি গিয়ে ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

—বেঁচে থাক বাবা। বললেন হেডমাষ্টারমশাই।

—কি মনে করে নায়েবমশাই? ছেলেটিকে চিনলাম না তো? জিজ্ঞাসা করলেন উনি।

—আজ্ঞে আমাদের ছোট কর্তামশাইয়ের ছেলে এটি। এর ভর্তির কথাই আপনাকে বলেছিলাম।

—ও হ্যাঁ। তা এদের এখানে থাকাই ঠিক হল শেষ পর্যন্ত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তা খোকা তুমি কলকাতায় কোন ক্লাসে পড়তে বাবা?

অমল বলল—আমি ক্লাস সেভেনের ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে এসেছি। যখন আসি তখনো রেজাল্ট বার হয় নি।

—তা বাবা পড়াশুনায় তুমি কেমন? এখানে ক্লাস এইটে ভর্তি হতে পারবে তো?

—আমি বরাবর ফার্স্ট হই স্যার। আমি পারব।

—ফার্স্ট হও! ও নায়েবমশায় এ যে হীরের টুকরো ছেলে! বেশ বাবা বেশ, শুনে খুব খুসি হলাম। মন দিয়ে পড়বে। বরাবর ফার্স্ট হবে। দেশের দশের মুখ উজ্জ্বল করবে। এই তো চাই।

—আমি মন দিয়ে পড়ব স্যার। বলল অমল।

—হ্যাঁ, নইলে মুসকিল আছে। তোমাদের ক্লাসে শোভান বলে একটা ছেলে আছে, তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না।

—সে ফার্স্ট বয় বুঝি? জিজ্ঞাসা করল অমল।

—শুধু ফার্স্ট নয়। সব বিষয়ে ফার্স্ট। কিন্তু ছেলেটা বড় দুষ্টু। সারাক্ষণই দুষ্টুমি করে বেড়াচ্ছে। তুমি দুষ্টু নও তো?

এ কথার কোন উত্তর দিল না অমল। মাথা নিচু করেই দাঁড়িয়ে রইল।

হেডস্যার কেরাণী বাবুকে ডেকে পাঠিয়ে অমলের নাম খাতায় তুলে নিতে বললেন। সে চলে যেতেই ঘরে ঢুকলেন ছোট মাষ্টারমশাই। তাঁকে দেখে হেডস্যার বললেন—নিন মতিবাবু আপনার জন্য আর একটি রত্ন এনে হাজির করলাম। বরাবর ফার্স্ট হয়। এর দায়িত্বও সব আপনার। বুঝে নিন ছাত্রটিকে। তা বাবা তোমার নামটি কি তা তো বললে না।

—আমার নাম অমল চৌধুরী স্যার।

—বাঃ বাঃ বেশ নাম।

মতিমাষ্টার জিজ্ঞাসা করল—তুমি বল খেলতে পার খোকা?

—পারি।

—মারামারি করতে পার?

এ কথা শুনে কেমন যেন ঘাবড়ে গেল অমল। কোন উত্তরই দিতে পারল না এ কথার।

—ওটাও শিখে নেবে। নইলে শোভানের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না বলে দিলাম। বললেন মতিমাষ্টার।

—আঃ, ছেলেটাকে আপনি ঘাবড়ে দিচ্ছেন। বললেন হেডস্যার। —ও মারামারি করবে কেন? ও করবে পড়াশুনা।

মতিমাষ্টার বললেন—শুধু বইয়ের পোকা দিয়ে দেশের কোন কাজটা হবে শুনি স্যার?

নায়েবমশাই বললেন—তাহলে আমরা এখন যেতে পারি। কি বলেন?

—হ্যাঁ আসুন। বললেন হেডস্যার—তবে কলকাতার স্কুল থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেটটা আর ওর পরীক্ষার রেজাল্টটা আনিয়ে দেবেন। ও দুটো আমাদের লাগবে।

নায়েবখুড়ো বললেন—তার জন্য আমি আগেই কলকাতায় লিখে দিয়েছি। কাগজগুলো এলেই দফ্‌তরে জমা করে দিয়ে যাব।

—বেশ বেশ। যান, কেরাণীবাবুর কাছে নামটা লিখিয়ে টাকা জমা দিয়ে যান। কবে স্কুল খুলবে তাও জেনে যাবেন।

সব কাজ শেষ করে বাইরে বার হয়ে এসে অমল আবার স্কুল বাড়িটার দিকে তাকাল। নাঃ, সত্যি বহুদিনের পুরনো বাড়ি। ছাদের কাছে মাঝ বরাবর বাঁকা করে বড় বড় হরফে লেখা আছে ভুবনমোহিনী হাই স্কুল। স্থাপিত সন ১৮৯৬। চুণ সুরকির লেখার অনেকগুলো হরফ্‌ই জায়গায় জায়গায় খসে পড়েছে। এ স্কুলই এখন ওর নিজের স্কুল।

॥ তিন ॥

স্কুল খোলার দিন সকাল থেকেই অমলের ফুরসত নেই। নতুন বইগুলোকে বার বার নেড়ে চেড়ে গুছিয়ে রাখছে। থেকে থেকে মার কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করছে—মা তোমার রান্না হল? এত কি রান্না করছ? আমার যে দেরি হয়ে যাবে।

মা বিরক্ত হয়ে বললেন—এখন তো কাছারি ঘরের ঘড়িতে মাত্র সাড়ে আটটা বেজেছে। এখনই কি তুই স্কুলে যাবি নাকি?

—ও ঘড়ি ঠিক চলছে না মা।

—শোন কথা ছেলের। তোর জন্য কি ঘড়ির কাঁটা আগে আগে যাবে নাকি?

একটু লজ্জা পেয়ে ঘরে গিয়ে দু দণ্ড বসল অমল।

খানিক পরে মা ডেকে বললেন—ওরে খোকা যাবার সময়ে সুলেমান চাচাকে রোজ সঙ্গে নিয়ে যাস। ও তোকে দিয়ে আসবে আর নিয়ে আসবে।

—না, মা, না। মিনতি করে বলল অমল—আমি একলাই যেতে পারব। পথে তো গাড়ি ঘোড়া নেই মা।

—না তা হক। এ বিদেশ বিভুঁই।

—বা রে। আমি কি এখনো ছেলেমানুষ আছি নাকি। কেউ দেখে ফেললে হাসবে মা। আমি একলাই যাব। কোন কিছু হবে না তুমি দেখো।

—বুঝি না বাপু তোর কথাবার্তা। রাগ করে মা বললেন—সুলেমান সঙ্গে যাবে এই আমার শেষ কথা।

স্কুলে যাবার সব আনন্দই মাটি হয়ে গেল অমলের।

স্কুলে যখন পৌঁছাল ও তখনো ঘণ্টা পড়তে দেরি। ও ঘর খুঁজে খুঁজে ক্লাসে গিয়ে বসল। ঘরে তখন কেউ নেই। প্রথম বেঞ্চের একপাশে বই খাতা নামিয়ে রেখে বাইরের বারান্দার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ও। ছেলে যারা এসেছে, তারা বাইরের মাঠে হুটোপাটি করছে, চেঁচাচ্ছে আর খেলা করছে। কয়েকজন মাষ্টারমশাই ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক যাওয়া আসা করছেন। কেউ ওর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছেন না। একলা মনে হতে লাগল ওর। ছেলেদের সঙ্গে গিয়ে যে ও খেলা করবে সে সাহসও হল না। কাউকেই তো চেনে না। কিছুই করার নেই ওর, এক মনে তাই ছেলেদের খেলাই দেখছিল ও। এমন সময় বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে একটা ছেলে উঠে এল ওর সামনে। হাতে বই খাতা। গায়ে একটা ময়লা চাদর। খালি পা। সোজা এসে ছেলেটা ওর সামনে দাঁড়াল—তুমি কি নতুন ভর্তি হয়েছ এ স্কুলে?

—হ্যাঁ।

—কোন ক্লাসে?

—ক্লাস এইটে।

—তাই নাকি? ভালই হল। আমিও সেই ক্লাসে পড়ি। তোমার বই খাতা আননি?

—এনেছি।

—কোথায় রেখেছ? এস ভিতরে এস। ছেলেটা ওকে ডাকল—আমার নাম দেবেশ ভট্টাচার্য। তোমার নাম কি ভাই?

—অমল চৌধুরী।

—ও তুমি চৌধুরী বাড়ির ছেলে। নতুন এসেছ?

—হ্যাঁ কলকাতা থেকে।

—সবার সঙ্গে ভাব হয়েছে?

—না। আজই প্রথম স্কুলে এলাম।

—দাঁড়াও। তাহলে সবাইকে ডাকি। বলে ছেলেটা উঠে চলে গেল বাইরে। কিছুক্ষণ বাদেই দশ বারোটা ছেলে হৈ হৈ করতে করতে ঘরে ঢুকল।

—কোথায়? কোথায়, নতুন ছেলেটা?

—তোর নাম কি ভাই?

সবাই ওকে ঘিরে ধরল। এক এক জনের এক এক রকম প্রশ্ন। তার জবাব দিতে গিয়ে ঘাবড়ে গেল অমল।

ঝাঁক্‌ড়া চুলওয়ালা একটা ছেলে এতক্ষণ একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ সে এগিয়ে এসে চেঁচিয়ে উঠল—তোরা সবাই চুপ করবি?

সবাই হঠাৎ চুপ করে গেল। ছেলেটা আরও দু পা ওর দিকে এগিয়ে এসে বলল—এই তুই ফাস্ট বেঞ্চে তোর বই রেখেছিস কেন?

ভয়ে ভয়ে অমল বলল—কেন, তাহলে কোথায় রাখব?

—লাস্ট বেঞ্চে। শহুরে ভূত, জানিস না ফাস্ট বেঞ্চে যারা ফাস্ট সেকেণ্ড হয় তারা বসে। যা, তোর বই নিয়ে যা এখান থেকে। গেলি?

দুবার ঢোক গিলে অমল বলল—কেন, আমিও ক্লাসে ফাস্ট হতাম।

—কচু হোতিস। ঐ তো তোর তালপাতার সেপাই চেহারা। তুই আবার হবি ফাস্ট। মিথ্যা কথা বলছিস তুই। যা, গেলি তোর বই খাতা নিয়ে?

—বাঃ। অমল বলল—এতো অন্যায়। আমি কেন যাবো?

—ফের মুখে মুখে কথা বলছিস! এক ঘুষিতে দেব তোর মুণ্ডু ঘুরিয়ে।

একথা শুনে ভীষণ রাগ হল অমলের বলল—দাও না দেখি কত সাহস তোমার!

তবে রে!

ছেলেটা ওর দিকে এগিয়ে আসতেই রাগের মাথায় ধাঁই করে এক ঘুষি বসিয়ে দিল অমল।



মুখে একটা বিশ্রী আওয়াজ করে ছেলেটা দু হাতে সমানে ঘুষি চালাতে শুরু করে দিল। সে ঘুষির সামনে অমল যেন কেমন অসহায় হয়ে পড়ল।

কিন্তু সে শুধু কিছুক্ষণের জন্য। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ও আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল ছেলেটার উপরে। হৈ হৈ করে ক্লাসের অন্য ছেলেরা সবাই চিৎকার করে উঠল। ওরা সবাই মজা দেখছে।

অমলের কানে এল ওর নতুন বন্ধু দেবেশ চেঁচাচ্ছে—এই শোভান। একি করছিস তুই? ছাড় বলছি। ছাড়লি ওকে।

নইলে আমি এখুনি যাব কিন্তু হেডস্যারের কাছে। তখন বুঝবি মজা।

শোভান চেঁচিয়ে উঠল—ওই তো আগে আমাকে মারল।

—তুই কেন মিছি মিছি ওর পেছনে লাগলি ?

—বেশ করেছি। ও ফার্স্ট বেঞ্চে বসবে কেন ?

—ছাড়বি নাতো। আমি যাচ্ছি তাহলে হেডস্যারের কাছে।

অমলের মনে হল এই তাহলে শোভান। যার কথা ছোটস্যার বলেছিলেন। রাগটা যেন হঠাৎ আরও বেড়ে গেল অমলের। শহরের ছেলে হয়ে ও কি না, হেরে যাবে একটা গাঁয়ের ছেলের কাছে। না তা কিছুতেই হবে না। এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ধাঁই ধাঁই করে আরও গোটা কতক ঘুষি চালিয়ে দিল ও।

লড়াই যে কতক্ষণ চলত কে জানে। হঠাৎ শক্ত হাতে কে যেন অমলকে জোর করে পেছনে টেনে নিল। হুঁস ফিরে আসতেই ও দেখে, কি সর্বনাশ ! পাশেই দাঁড়িয়ে সেই স্যার ! ভয়ে ও মাথা নিচু করল।

—ব্যাপার কি ? এঁ্যা, বলি কি ব্যাপার ? চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি—এটা কি স্কুল না লড়াইয়ের ময়দান ? কি হয়েছে শুনি ?

অমল কোন কথারই উত্তর দিল না।

—এই শোভান। এই উল্লুক পাজি বদমাস। কি হয়েছে বল ? নইলে বেতিয়ে পিঠের ছাল তুলে নেবো আমি।

—আমি কিছুই জানিনা স্যার। ওকে জিজ্ঞেস করুন। ঝটপট শোভান উত্তর দিল।

—এ্যাঃ সাধুপুরুষ ! কিছুটি জানে না। বেশ, এই নতুন ছেলে, তুমিই বল কি হয়েছে। বল বলছি।

একটু ভেবে। একবার ঢোক গিলে অমল বলল—কিছু হয়নি স্যার।

—এঁ্যা, কি বললি ? কিছু হয়নি !

—হঁ্যা স্যার।

—কিচ্ছু হয়নি তো তোরা অমন মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিলি কেন ? এত হট্টগোল কিসের ?

শোভান বলল—আর করব না স্যার।

—পাজি উল্লুক ছুঁচো নচ্ছার। যা, যে যার জায়গায় বোস গিয়ে। গেলি সবাই ?

সবাই হুড়মুড় করে গিয়ে যে যার জায়গায় বসে পড়ল।

—এই নতুন ছেলে, কি নাম তোমার যেন ? তুমি বসেছ কোথায় ?

—ফাস্ট´ বেঞ্চে স্যার। আস্তে আস্তে অমল উত্তর দিল।

—হ্যাঁ, তাই বসবে তুমি। যাও বস গিয়ে।

বুক ফুলিয়ে অমল গিয়ে বসল ফাস্ট´ বেঞ্চে। ঠিক শোভানের পাশেই।

যাবার আগে স্যার বলে গেলেন—এখুনি ঘণ্টা পড়বে! ফের যদি কারও চেঁচামেচি শুনি তো আর আস্ত রাখব না।

স্যার চলে যেতেই আড়চোখে অমল শোভানের দিকে তাকাল। শোভানও যেন তার জন্য তৈরী ছিল। মস্ত বড় জিভ বার করে ও ভেংচাল। তা দেখেও দেখল না অমল। বাপ্‌রে, যা ঘুষির জোর ছেলেটার!

ঘণ্টা পড়ল। মাষ্টারমশাই এলেন। কাকে কি বই কিনতে হবে তার ফিরিস্তি দিলেন। ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিলেন সব বইএর নাম। এসব করতেই উনি যখন ব্যস্ত তখনি শোভান একটা কাগজে কি যেন লিখে অমলের খাতার মধ্যে গুঁজে দিল। কাগজটা খুলে অমল দেখল তাতে লেখা, বাপরে তোর ঘুষির কি জোর। কি নাম তোর ? আমার নাম শোভান আলি।

এদিক ওদিক দেখে পকেট থেকে পেনসিল বার করে অমল ঐ

কাগজেরই একধারে লিখে দিল—উঃ! তোর ঘুষিরও কি কম জোর। আমার নাম অমল চৌধুরী। তোর লাগে নি তো?

উত্তর এল। না লাগেনি আবার? ভাব।

উত্তর গেল। মাপ কর ভাই। ভাব।

মুখ ফিরিয়ে দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে ফিক্ করে হেসে ফেলল।

দুচার দিনেই সবার সঙ্গে অমলের ভাব হয়ে গেল।

শোভান আলি ফার্স্ট বয়। শীতল মণ্ডল সেকেণ্ড বয়। তারাচাঁদ ভুঁইয়া থার্ড বয়। দেবেশ ভট্টাচার্য ফোর্থ বয়। ক্লাসের সব থেকে ছোট ছেলে মুকুন্দ। তাছাড়াও আরও অনেকে। আলতাব। মদন। মথুর। কালী। সনাতন। ইয়াসিন। আরও আরও।

প্রথম দিন থেকেই সবাই ওকে বেশ মেনে চলতে আরম্ভ করল। শহুরে ছেলে তো কম নয়! শোভানকে মেরে প্রায় শুইয়েই দিয়েছিল আর কি। তেমন ছেলেকে মেনে চলতেই হবে।

স্কুল বেশ ভালই লাগল অমলের। মাষ্টারমশাইরাও ভাল। আর ভাল ক্লাসের ছেলেরা। সবাই অবশ্য ওদের গ্রামের নয়। কেউ কেউ আসে দূর গ্রাম থেকে হেঁটে।

দেবেশ আর শোভানের সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়ে গেল। দেবেশের বাবা গ্রামের পুরোহিত। সব বাড়িতেই পুজো করে বেড়ান তিনি। ওদের বাড়িতেও যান। বড় গরীব দেবেশরা। তার থেকেও গরীব শোভানরা। ওর বাবা বেঁচে নেই। ওর মা এবাড়ি ওবাড়ি ধান ভেঙ্গে আর দু'এক বিঘা যা ধান জমি আছে তার রোজগার থেকে ছেলেকে স্কুলে পাঠান। পড়াশোনায় শোভান খুব ভাল। কিন্তু সব বই কেনার মতন ওর পয়সা নেই। এর ওর কাছে থেকে বই চেয়ে ও কাজ চালিয়ে নেয়।

কতদিন শোভান বলেছে—আজ ওর পেট ভরে খাওয়া হয়নি। শুনে অমলের বড় মন খারাপ হয়ে যায়।

মাকে অমল একদিন বলল—মা আমাকে রোজ যে জল খাবার পাঠিয়ে দাও, তা খুব বেশি করে দিও।

—কেন রে ? মা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

—আমার বন্ধুরা কতদিন না খেয়ে স্কুলে আসে। ওদের সামনে আমার একলা টিফিন খেতে লজ্জা করে।

—ও এই কথা। বেশ আমি বেশি করে নয় জলখাবার পাঠিয়ে দেব।

সেদিন থেকে রোজ টিফিনের সময় শোভানকে ডেকে নিয়ে পুকুর পাড়ে গিয়ে বসে টিফিন ভাগ করে খায় অমল !

—তুই রোজ আমার জন্য খাবার আনিস কেন ? একদিন শোভান জিজ্ঞাসা করল।

—বাঃ, তুই যে না খেয়ে আসিস। বলল অমল।

—আমি বুঝি একলাই না খেয়ে আসি ? এমন তো কত ছেলেই আসে। তাদের সবাইকে তুই টিফিন দিতে গেলে চৌধুরী বাড়ি ফতুর হয়ে যাবে।

—আমি তো সবাইকে চিনি না। আমি শুধু তোকে চিনি।

একথা শুনে শোভান যেন কেমন হয়ে যেত। চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থেকে বলত—জানিস, মতিস্যার বলেন আমাদের এমন অবস্থার জন্য বৃটিশরা দায়ী।

—তার মানে ? অবাক অমল জিজ্ঞাসা করত।

—সোজা মানে। বৃটিশরা তাদের দেশের লোকদের খাওয়াবে বলে আমাদের দেশের সব খাবার নিয়ে যায়। তাই আমার মতন অনেক ছেলেদেরই খেতে জোটে না।

—দূর, তা কি হয় !

—হ্যাঁ তাই হয়। মতিস্যার কখনো ভুল বলেন না। তিনি বলেছেন দেশ স্বাধীন হলে আমাদের কোন দুঃখ থাকবে না।

—আমি এসব বুঝি না। বলল অমল—মা ,বলেছে শুধু মন দিয়ে পড়াশোনা করবি। আমি তাই করি।

—বোকারাম। পড়াশোনা কেন করিস বলতো ? জিজ্ঞাসা করল শোভান—লেখাপড়া শিখে করবি কি ?

—কেন অনেক বড় হব। বড় হয়ে ভাল চাকরি করব। আর অনেক টাকা রোজগার করে এনে মাকে দেব।

—না তা নয়। মতিস্থার বলেছেন, লেখাপড়া শিখে আগে তোমরা দেশকে স্বাধীন করবে, তার পরে অন্য কাজ। লেখাপড়া শিখে সবাই চাকরি খুঁজলে অত চাকরি কই ? আর তাহলে দেশকে কে স্বাধীন করবে ?

—আমি ভাই ও সব বুঝি না। মার বড় দুঃখ, আমি মাকে আগে সুখী করব।

—দেশ বুঝি তোর মা নয় ? এই লেখাপড়া শিখছিস তুই ?

এ কথার কোন উত্তর দিতে পারল না অমল।

শোভান হেসে বলল—তুই হেরে গেলি অমল। আমি তো তোকে কিছুই বোঝাতে পারলাম না। মতিস্থারের কাছে গেলে তিনি তোকে আরও ভাল করে সব কথা বুঝিয়ে দেবেন। যাবি একদিন ওর বাড়িতে ?

—মাকে জিজ্ঞাসা করে বলবো। বলল অমল।

—হ্যাঁ তাই করিস।

সন্ধ্যেবেলা মাকে এসব কথা বলতেই মা খুব রেগে গেলেন, বললেন—ঐ হতচ্ছাড়া ছেলেটার সঙ্গে তুই মিশিস কেন! শেষে কি একটা বিপদ ঘটাবি ?

—কিসের বিপদ মা ?

—এ সব কথা যারা বলে তারা স্বদেশী। জানতে পারলে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে ফাটকে পুরে দেবে। মিশিস না ওসব ছেলের সঙ্গে কখনও।

কিছুই ঠিক বুঝতে না পেরে অমল মার কাছ থেকে চলে এল।

এ সব কথাই ও পরদিন চুপি চুপি দেবেশকে বলল—এখন আমি কি করি বল ভাই? এখুনি তো শোভান আসবে আমার সঙ্গে কথা বলতে।

একটু ভেবে দেবেশ বলল—মতিস্যার স্বদেশী, একথা তুই জানতিস না?

—না তো।

—দেখ অমল, একটু থেমে থেমে দেবেশ বলল—আমরাও খুব গরীব ভাই। আর আমিও লেখাপড়া করছি আমার বাবা মার দুঃখ ঘোচাব বলে। আমি তা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি না। আমরা যদি বড়লোক হতাম তো আমিও ভাই মতিস্যারের দলে নাম লেখাতাম।

—তুইও বলছিস এ কথা?

—হ্যাঁ, কেন বলবো না। মতিস্যার বলেছেন দেশ স্বাধীন হলে পড়াশোনা সব ফ্রি হয়ে যাবে। লোকে পেট ভরে খেতে পারবে। আরও কত কি। পড়াশোনা যদি ফ্রি হয়ে যায় তাহলে ভাই আমিও মতিস্যারের দলে।

—তাহলে তুইও স্বদেশী?

—তাতে তো ভাই কোন পাপ নেই।

—পুলিসে যদি ধরে তোকে, তবে?

—মতিস্যার বলেছেন কত দেশে কত লোক তাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়েছেন আর এখানে তো শুধু জেল হবে! সে আর এমন কি। গান্ধী মহারাজও তো কত বার জেলে গেছেন।

পুকুর পাড়ে বসে ওরা কথা বলছিল। এমন সময় শোভান এসে হাজির। ওদের দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল—আরে তোরা এখানে আর আমি সারা ইস্কুল তোদের খুঁজে বেড়াচ্ছি। কি কথা হচ্ছিল শুনি?

অমল ব্যস্ত হয়ে বলল—সে কথা থাক ভাই।

—বাঃ কেন থাকবে শুনি। আমি কি শুনতে পারি না সে কথা ?

—কিছু কথা হচ্ছিল না। বলল অমল—তুই আমাদের খুঁজছিস কেন বল ?

—এমনি। বলে কেমন করে যেন তাকাল শোভান—কি কথা লুকোচ্ছিস অমল ? বল বলছি।

দেবেশ বলল—সে কথা ও তোকে বলতে পারবে না।

—কেন ?

—শুনলে তুই দুঃখ পাবি তাই।

—ছাই পাব। বল কি কথা। বল বলছি।

অমল বাধা দেবার আগেই দেবেশ বলল—অমলের মা ওকে তোর সঙ্গে মিশতে বারণ করেছেন।

—কেন ? আমি কি করেছি ?

—তুই স্বদেশী। তুই মতিস্যারের দলের লোক তাই।

—ওঃ এই কথা। ফিক্ করে হেসে শোভান ওদের মাঝখানে বসে পড়ে বলল—খবরদার অমল আমার সঙ্গে আর কথা বলবি না বলে দিচ্ছি। বলবি তো সোজা চাচির কাছে গিয়ে বলে দেব। এখন দেবেশ, ও তোকে বলুক ও কি খাবার এনেছে। আমার বড্ড খিদে পেয়েছে। আজ ওর ভাগেরটাও আমি সাবাড় করে দেব। মজা টের পাবে তখন ও।

ওর কথা শুনে অমলও ফিক করে হেসে ফেলল।

বাড়ি ফিরতেই মা জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁরে খোকা সেই ছেলেটার সঙ্গে আজও মিশেছিস তুই ?

—কোন ছেলেটা মা ? না বোঝার ভান করে অমল জিজ্ঞাসা করল।

—সেই যে স্বদেশী কথা বলে।

—না মা তার সঙ্গে আমি আজ একটাও কথা বলি নি।

—হ্যাঁ, কথা বলবি না। পড়াশোনা করবি আর চলে আসবি। ও সব কথায় তোর থাকার দরকার কি?

রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে অমল বলল—মা স্বদেশী কথা কি খারাপ?

সারাদিন নানান কাজের পর ঘুম আসছিল ওর মার। ঘুম জড়ানো গলায় উত্তর দিলেন—জানিনা বাপু ভাল কি মন্দ। আমরা গরীব, আমাদের ওসব করতে নেই।

—কিন্তু মা, শোভানরা তো আমাদের থেকেও গরীব।

—তার আমি কি জানি। ওসব কথা বললে পুলিসে ধরে নিয়ে যায়। তোকে ধরে নিয়ে গেলে আমি কি করব বল তো?

—না মা, আমাকে কেউ ধরতে পারবে না! তুমি দেখো।

ঘুম ছুটে গেল মার! ব্যস্ত হয়ে বললেন—ওরে পাজি ছেলে, তার মানে তুই ওদের দল ছাড়বি না?

—আমি তাই বললাম বুঝি?

—বুঝিনা বাপু তুই কি বলিস। আমার ভয় করে। বলে ছেলের হাতটা ধরে নিজের মাথার উপরে রেখে বললেন—তুই আমাকে ছুঁয়ে বল খোকা, তুই আর ওদের দলে থাকবি না।

—বাঃ, আমি তো বলেছি আমি আর ওদের সঙ্গে কথা বলব না।

—বেশ, নে তাহলে এখন ঘুমো। নিশ্চিন্ত হয়ে মা পাশ ফিরলেন।

পরদিন স্কুলে যেতেই অমলের দেখা হয়ে গেল ছোটস্যারের সঙ্গে। ও পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল। উনি ডাকলেন—শোন শোন, কি যেন নাম তোমার?

—আমার নাম অমল স্যার।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তা স্কুল তোমার লাগছে কেমন?

—ভাল।

—পড়াশোনা করছ তো মন দিয়ে?

—হ্যাঁ স্যার।

—পারবে শোভানকে হারাতে?

হেসে অমল বলল—চেষ্টা করব স্যার।

—তা তুমি আস না কেন আমার বাড়িতে রোজ সন্ধ্যেবেলা? শোভানরা তো আমার ওখানেই পড়াশোনা করে। তোমার কিছু বোঝার থাকলে তুমিও এসো। বুঝলে?

—মা আসতে দেয় না স্যার। লজ্জায় লাল হয়ে অমল বলল।

—কেন? আমার ওখানে এসে পড়াশুনা করলে তোমার ভালই হবে। মাকে বুঝিয়ে বলবে। বুঝলে?

—আচ্ছা। বলে চলে আসছিল অমল।

হঠাৎ মতিস্যার জিজ্ঞাসা করলেন—সে দিনকার মারামারিতে কে জিতেছিল? তুমি না শোভান?

না বোঝার ভান করে অমল বলল—কই? আমরা তো মারামারি করিনি স্যার।

হা হা করে হেসে উঠলেন মতিস্যার। বললেন—আমি জানি সব। দেখো, পড়াশোনা শুধু করলে কি হবে, যদি গায়ে না জোর হয়? যদি যা সত্যি, তা না প্রতিষ্ঠা করতে পার?

এ সব কথার কোন মানেই বুঝতে পারল না অমল। চুপ করে দাঁড়িয়েই রইল। মতিস্যার বললেন—আচ্ছা তুমি ক্লাসে যাও। মাকে আমার কথা বলবে। যদি মত দেন আসবে আমার বাড়িতে।

তাড়াতাড়ি ওখান থেকে চলে এল অমল। বারান্দা পার হয়ে দোতলায় সিঁড়ির সামনেই দেখা হল ওর দেবেশের সঙ্গে।

দেবেশ জিজ্ঞাসা করল—হ্যাঁরে, মতি স্যার তোকে কি বলছিলেন?

—ওঁর বাড়িতে যেতে বলছিলেন।

—দূর, তুই যাবি কেন? বলল দেবেশ—আমরা যাই কারণ আমরা বই কিনতে পারি না, তাই।

—তোরা সবাই যাস? জিজ্ঞাসা করল অমল।

—হ্যাঁ, অনেকেই যায়। অনেকেই তো বই কিনতে পারে না। মতিস্যার সন্ধ্যেবেলা আমাদের সবাইকে পড়ান, অমনি।

করুণ ভাবে অমল বলল—আমাকে মা যেতে দেবে না রে।

—তাতে কি, তুই বাড়িতেই পড়বি। বলল দেবেশ।

সন্ধ্যেবেলা হ্যারিকেনের সামনে পড়ার বই খুলে বসে অমল ছটফট করতে লাগল। মা জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁরে খোকা, আজ অমন করছিস কেন?

—আমি পড়া কিছুই বুঝতে পারছি না মা।

—সে কি রে, ইস্কুলে তবে পড়ে এলি কি?

—পড়েছি তো, তবুও বুঝতে পারছি না।

—কই দেখি কি পড়া।

রাগ করে অমল বলল—এতো অঙ্ক। এর তুমি কি বুঝবে মা? আমিই বলে বুঝতে পারছি না।

—তাহলে আঁক কষবি কেমন করে?

—কষতে পারবো না।

—তাহলে উপায়?

খুশি হয়ে অমল বলল—মা আমি একবার মতিস্যারের বাড়িতে গিয়ে আঁকগুলো বুঝে আসব?

—এই ভর সন্ধ্যেবেলায়!

—তাতে কি মা, যাব আর আসব।

—কিন্তু উনিই বা তোকে বিনা পয়সায় পড়াবেন কেন?

—পড়াবেন মা। উনি রোজ সন্ধ্যেবেলা ছেলেদের পড়ান ওঁর বাড়িতে। আমাকেও যেতে বলেছেন।

—কি জানি বাপু আমি কিছু বুঝি না। যেতে যখন বলেছেন

যাও। কিন্তু স্থলেমান চাচাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। আর বেশি রাত কর না। তোমার তো আবার কোথাও গেলে সময়ের জ্ঞান থাকে না।

মতিস্যারের নিজের দেশ সেই ছোট কালিকাপুরে। পদ্মজলা পার হয়ে ছোট কালিকাপুর। সেখান থেকে রোজ আসা যাওয়া করা মুস্কিল বলে এ গাঁয়েই একটা ঘর নিয়ে থাকেন। প্রতি শনিবার বিকেলে সাইকেলে চড়ে চলে যান ছোট কালিকাপুর। আবার ফেরেন সোমবার সকালে। এ সব কথা অমল শুনেছিল কিছু স্থলেমান চাচার কাছ থেকে কিছু শোভানের কাছে। ছোট স্যার বিয়ে করেছিলেন অনেক আগেই। কিন্তু তাঁর বউ মারা গেছেন। একটা মেয়ে থাকে বাড়িতে তার ঠাকুমার কাছে। এই বুড়ি মা আর ছোট মেয়েটার জন্যই ছুটির দিনে ছুটে চলে যান ছোট কালিকাপুরে।

পথে নেমে স্থলেমান বলল—আচ্ছা বাপজান, তুমি ছোটমাস্টারের বাড়ি যাচ্ছ, এ কাজটা কি ভাল হচ্ছে ?

—কেন চাচা ? অবাক হয়ে অমল জিজ্ঞাসা করল।

—ছোটমাষ্টারের ওখানে তো সন্ধ্যেবেলা গাঁয়ের যত গরীব গুবরোদের ছেলেরা যায়। তুমি আমাদের রাজাবাবুর ছেলে, তুমি যাবে কেন সেখানে ?

—তাতে কি হয়েছে ? বলল অমল—আমি তো পড়তে যাচ্ছি। পড়া হলেই চলে আসবো।

—তাহলে ওদের সঙ্গে মিশবে তুমি !

—বাঃ, ওরা স্কুলে যায় না ? সেখানে কি আমার জন্য একলা ক্লাস হয় নাকি ?

—তা বটে। মাথা চুলকে বলল স্থলেমান—আমরা এসে গেইছি। ঐ যে সামনে ঘর, ওটাই ছোটমাষ্টারের আস্তানা। তুমি এগোও। আমি ঘণ্টা খানেক বাদে এসে তোমাকে নিয়ে যাব, বুঝলে ?

—আচ্ছা। বলে অমল হন হন করে ঘরের দাওয়ায় এসে উঠল। বাইরে হিমেল হাওয়া বইছে বলে ঘরের দরজা ভেজানো। সেই ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরের আলো এসে পড়েছে বাইরে। ভিতরে কোন জনমানুষের সাড়া নেই। ছোটস্যার নেই নাকি? মনে হল অমলের। আস্তে দরজাটা ঠেলা দিতে খুলে গেল। সামনে তাকিয়ে দেখল ও, মেঝেতে চট পেতে একদল ছেলে বই খাতা নিয়ে বসে পড়ছে। তাদের সামনে বসে ছোট-স্যার একটা খাতার উপরে ঝুঁকে পড়ে পেনসিল দিয়ে দাগ কাটছেন।

দরজা খুলতেই সবাই ওর দিকে তাকাল। সবাই অবাক। ও একটু থমকে দাঁড়াল। মতিস্যার ব্যস্ত হয়ে ডাকলেন—আরে এসো এসো। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দাও, ঠাণ্ডা আসছে!

ভিতরে ঢুকে অমল দরজাটা বন্ধ করে দিল।

—এস, বস এইখানে। বললেন মতিস্যার।

বই খাতা সামনে রেখে বসে পড়ল অমল। কেমন যেন অদ্ভুত মনে বল ওর। অমন যে দুষ্টু শোভান সে চুপ করে বসে পড়ছে! অত কথা বলে দেবেশ। সে-ও কথা বন্ধ করে কি যেন লিখছে! শুধু ওরা কেন, সবাই যে যার পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত।

বাড়ি ফিরে অমল বলল—মা আমি রোজ ছোটস্যারের বাড়িতে পড়তে যাব। এত সুন্দর করে সব উনি বুঝিয়ে দেন। তুমি না কর না মা, দেখো তাহলে আমি নিশ্চয়ই এখানেও ফার্স্ট হব। শোভান আমার সঙ্গে পারবে না।

ছেলের পড়াশোনার সুবিধা হবে···মা আর আপত্তি করলেন না। রোজ মতিমাষ্টারের বাড়িতে যেতে আরম্ভ করল অমল। শুধু কি পড়ান মতিস্যার? না। রোজ পড়া শেষ হয়ে গেলে কত সুন্দর গল্প বলেন। কত দেশ বিদেশের কথা। বিজ্ঞানের কথা। দেশের সব বড় মানুষের কথা। আরও বলেন—তোমরা কেন

লেখাপড়া শিখছ ? কেন জান ? আমাদের দেশ বড় গরীব। আমাদের দেশের বেশির ভাগ লোকই পেট ভরে খেতে পায় না। লেখাপড়া শিখবার সুযোগ পায় না। তোমরা যখন সে সুযোগ পেয়েছ তখন তোমাদের মানুষের মতন মানুষ হতে হবে। এমন মানুষ যারা দেশের দুঃখ ঘোচাবে।

কোন কোন দিন বলতেন—মনে রেখ, মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই। কেউ ছোট না, কেউ বড় না। সবাই সমান। যাকে ছোট বল, সেও যদি তোমাদের মতো পড়াশোনা করবার সুযোগ পেত, সেও তোমাদেরই মতন মানুষ হতে পারত। তোমরাই বড় হয়ে সব মানুষকে সে সুযোগ করে দেবে। নইলে কিসের লেখাপড়া শেখা ?

সব থেকে ভাল লাগত অমলের, যখন উনি পৃথিবীর সব মনীষীদের কথা শোনাতেন। যখন গল্প বলতেন দেশের বিপ্লবীদের। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি, বাঘা যতীন, আরও আরও অনেকের কথা। বলতেন, সবার আগে আমাদের দেশকে স্বাধীন করতে হবে। তা না করতে পারলে দেশের মানুষের আমরা কোনো ভালই করতে পারব না। দরকার হলে তার জন্য আমাদের প্রাণ দিতে হবে। একজনের প্রাণের বদলে হয়তো কোটি কোটি প্রাণ বাঁচবে।

একদিন বই খাতা হাতে ঘর থেকে বার হয়ে আসবার সময় ফিস ফিস করে শোভান বলল—আমি ঠিক করে ফেলেছি বুঝলি অমল বড় হলে আমি ক্ষুদিরামের মত হব। নিশ্চয়ই হব।

দেবেশ বলল—ইস্ তবেই হয়েছে। তুই যা দুষ্টু, তুই হবি ক্ষুদিরাম!

—কেন ক্ষুদিরাম কি দুষ্টু ছিল না ছেলেবেলায় ?

—কখনই না। বলল দেবেশ—তাহলে কি অমন হয় ?

—এ্যাঃ, সব জানেন উনি! বলল শোভান—কাল আমি স্যার-কে জিজ্ঞাসা করব।

একদিন রাত্রে বাড়ি আসছে অমল। হঠাৎ পিছন থেকে ডাকলেন মতিস্যার—শোন অমল।

—কি স্যার ?

—কাল তো স্কুল ছুটি। কাল সকালে আমি আর বাড়ি যাব না। তুমি তোমার মাকে বলবে আমি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব।

—আচ্ছা স্যার। বলল অমল।

—এই নটা দশটা নাগাদ যাব, বুঝলে ?

—আচ্ছা স্যার।

একটু এগিয়ে এসে সুলেমান বলল—কি বোকা ছেলে গো তুমি।

—কেন ? কি করলাম আমি ?

—আরে, জিজ্ঞেস করলে না, কেন যাবেন উনি ?

—ঐ যাঃ ভুলে গেছি। বলে মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ল অমল।

—আর এখন ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে না। রাত অনেক হয়েছে। চল, মাঠানের কাছে বকুনি খাবে চল।

মা-ও শুনে হেসে বললেন—আচ্ছা ছেলে রে তুই! মানুষটা কেন আসবে তাও জিজ্ঞাসা করে এলি না ?

রাগ করে অমল বলল—বাঃ আমি জানি কি তার। উনি কি কিছু বলেছেন যে আমি বলব।

সকাল থেকেই অমল বার বার ঘর আর ফটক করে বেড়াতে লাগল। আটটা বেজে গেল। নটা বেজে গেল। যখন দশটা বাজে বাজে হঠাৎ পথের উপর সাইকেলের ঘণ্টা শোনা গেল ক্রিং ক্রিং করে। আর ওখানে না দাঁড়িয়ে একছুটে অমল মার কাছে গিয়ে হাঁপাতে লাগল—মা মা ছোটস্যার এসে গিয়েছেন। তুমি এসো।

মা বললেন—যাও, ওঁকে নিয়ে গিয়ে ঘরে বসাও। আমি আসছি এখুনি।

ছোটস্যার মাকে নমস্কার করে বললেন—আমি রোজই ভাবি আপনার কাছে আসব। সময় হয়ে ওঠে না, তাই পেরেও উঠিনে। আজ মা অনেক আশা নিয়ে একটা ভিক্ষে চাইতে এসেছি আপনার কাছে। নিরাশ করবেন না দয়া করে।

বিব্রত হয়ে মা বললেন—আপনি কি বলতে চান বলুন! আমার সাধ্য হলে আমি তা রাখব।

—অতি সামান্য কথা মা। আপনাদের এত বড় বাড়িটার সব ঘরই তো খালি পড়ে আছে। একটা ঘর আমাকে দেবার হুকুম হোক। আমি রোজ সন্ধ্যেবেলা ছেলেদের নিয়ে সেখানে বসব। আমার ছোট ঘরে আর জায়গা হয় না।

কি যেন একটু ভেবে মা বললেন—আমার নিজের কোনো আপত্তি নেই এতে। তবে হুকুম দেবার মালিকরা থাকেন কলকাতায়। আপনি এ নিয়ে নায়েবমহাশয়ের সঙ্গে কথা বলুন। বোধ হয় তিনি ব্যবস্থা করতে পারবেন।

—তাই করব মা। তাই করব। আপনার যখন মত পেয়েছি তখন আমি একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করে নেব।

খুশি মনে মতিস্যার নায়েবখুড়োর সঙ্গে কথাবার্তা বলে বাড়ি চলে গেলেন। উনি চলে গেলে নায়েবখুড়ো এসে বললেন—এ বাড়ির আপনার অংশের একখানা ঘর খুলে দিলে, কারও কোনো আপত্তি হতে পারে না মা। তাছাড়া অমল বাবাজীবন রোজ রাতে বাইরে পড়তে যায়, এটা আমার তেমন ভাল লাগে না। মতিমাস্টারের কেলাস এখানে বসলে, সে দিক থেকে ভালই হয়। কিন্তু মা বিপদ হয়েছে যে অন্য খানে। মতিমাস্টারের দলে যে মুসলমান ছেলেরাও আছে। আপনার যদি কোন অসুবিধা হয়!

—আমার অসুবিধা! কেন? মা জিজ্ঞেস করলেন।

—না, মানে, ছেলেমানুষ ওরা কি আর অত ছোঁয়াছুয়ি বিচার করে চলতে পারবে? শেষে হয়তো আপনাকেই মুস্কিলে পড়তে হবে।

ব্যস্ত হয়ে অমল বলল—না, খুড়োমশাই না। মতিস্যার বলেছেন জাতফাত সব বাজে কথা। সব মানুষই সমান। আমি ছুঁলে যদি মার জাত না যায় তো শোভান ছুঁলে যাবে কেন?

হেসে নায়েবমশাই বললেন—শুনুন মা শুনুন, আপনার ছেলের কথা! এরই মধ্যে উনিও মতিমাস্টারের চেলা হয়ে উঠেছেন। বলে নায়েবমশাই হেসে উঠলেন।

মা বললেন—ভদ্রলোক বড় আশা করে এসেছেন। আপনি আর তাঁকে নিরাশ করবেন না। ও আমি নয় ওদের সামলে চলবো এখন।

—লক্ষ্মী মা, very good মা! বলে অমল মাকে ধরে লাফাতে শুরু করে দিল।

শুরু হয়ে গেল মতিমাস্টারের আসা যাওয়া। বড় ঘর পেয়ে ছাত্র সংখ্যাও হঠাৎ বেড়ে গেল। সবাইকেই মন দিয়ে পড়ান মতি-মাস্টার। সবাইকেই গল্প বলেন। শোনান দেশ বিদেশের বড় বড় লোকদের কথা। সবাইকেই বলেন—বড় হয়ে তোমরা দেশের সেবা করবে। দেশের ভাল করার জন্যই তোমরা লেখাপড়া শিখছ, সে কথা যেন ভুলো না।

নায়েবখুড়ো বলেন—এ হচ্ছে মতিমাস্টারের পাঠশালা। পড়ুয়া সব চাষা ভুসো হাঁড়ি মুচি।

রাগ করে অমল বলত—তাতে কি হয়েছে খুড়োমশাই। ছোট-স্যার বলেছেন মানুষে মানুষে কোনো তফাৎ নেই। সবাই যে আমরা একই দেশের মানুষ।

নায়েবখুড়ো খুশি হয়ে বলতেন—এসব কথা তোমরা যদি মন দিয়ে শিখতে পার, তবে সত্যিই তোমরা দেশের একজন হতে পারবে।

একদিন রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে মা জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁরে খোকা তোদের স্যার খুব ভাল লোক, নারে?

—হ্যাঁ, মা।

—তবে যে তোরা বলতিস তোদের ছোটস্যার স্বদেশী দলের লোক।

—কই আমি তো কোনো দিন বলিনি। বলল অমল।

—কি জানি, তবে বোধ হয় আমি ভুল শুনেছি।

দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেল। স্কুলের পরীক্ষা এসে গেল। মতিমাস্টারের কাজ বেড়ে গেল অনেক। পড়ুয়াদেরও নাওয়া খাওয়ার সময় রইল না।

শোভান একদিন অমলকে জিজ্ঞাসা করলো—কি রে অমল, এবারে তুই ফার্স্ট হতে পারবি?

—নিশ্চয়ই। বলল অমল—এবারে তোকে হারিয়ে দেব!

—ইস্। অত সোজা আর কি।

—দেখিস তুই।

—বাজি?

—বাজি। একদিন তোকে পেটভরে খাইয়ে দেব।

পরীক্ষা হয়ে গেল। শোভান বলল—কচু পারবি তুই। কবে খাওয়াবি বল?

—আগে রেজাল্ট বার হোক।

রেজাল্ট বার হল। অমল ফার্স্ট, দেবেশ সেকেণ্ড, থার্ড শোভান।

—হেরে গেলি তো? অমল বলল।

—হুঁ। বলল শোভান—কিন্তু ভাই আমার বোধ হয় আর পড়াশোনা করা হবে না।

—কেন? অবাক হয়ে অমল জিজ্ঞাসা করল।

—হেডস্যার সেদিন বলছিলেন ফার্স্ট না হলে আর তিনি আমাকে ফ্রিতে রাখতে পারবেন না। স্কুলের আইনে আটকাবে।

—তাতে কি হয়েছে? তুই মাইনে দিয়ে পড়বি।

—আমার মা কি মাইনে দিতে পারবে?

একথা শুনে ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল অমলের। কিছু বলতে পারল না।

রাত্রিবেলা মতিস্যারের ক্লাসে গিয়ে শোভান মাথা নিচু করে একপাশে বসল।

—কিরে, অমলের কাছে হেরে গিয়ে মন খারাপ হয়ে গেছে নাকি তোর? জিজ্ঞাসা করলেন মতিস্যার—হারজিত এ তো আছেই বাবা, আসছে বছর হয়ত আবার তুই হারাবি অমলকে।

অমল আর থাকতে না পেরে বলল—স্যার ও আর স্কুলে পড়বে না স্যার।

—কেন?

— ও আর ফ্রিসিপ পাবে না স্যার। হেডস্যার বলেছেন।

—ও এই কথা। কি যেন একটু ভাবলেন মতিস্যার। বললেন —না না। পড়াশোনা তো ছাড়া চলবে না। তুই আসিস স্কুলে। দেখি আমি কি ব্যবস্থা করতে পারি, তোকে নিয়ে আমার অনেক আশারে শোভান। তুই পড়া ছাড়বি কিরে?

রাত্রিবেলা খেতে বসে অমল মাকে জিজ্ঞাসা করল—মা আমরা কি খুব গরীব?

—এ আবার তোর কি ধরনের কথা রে, খোকা?

—বল না মা, আমাকে কি স্কুলে ফ্রিতে পড়তে হবে?

—কে বলেছে তোকে।

—বাঃ, আমি তো ফার্স্ট হয়েছি। চাইলে আমাকে হয়তো ফ্রি করে দিতে পারে হেডস্যার।

—তবে তো ভালই। নায়েবমশাইকে একটা দরখাস্ত করে দিতে বলবো।

—কিন্তু মা শোভানের আর স্কুলে যাওয়া হবে না।

—কেন?

—ও তো এবারে থার্ড হয়ে গেছে, তাই ও আর ফ্রি পাবে

না। ওর মা-ও পয়সা দিয়ে পড়াতে পারবে না। ওরা ভীষণ গরীব মা।

—আহা। ছেলেটার ভবিষ্যত এমন করে নষ্ট হয়ে যাবে! তোদের হেডমাস্টারের কি এতটুকু দয়ামায়া নেই?

—মা আমরা তো গরীব নই। তুমি হেডস্যারকে লিখে দাও না, আমার ফ্রি চাই না। সেটা যেন উনি শোভানকে দেন।

—তুই তো জানিস খোকা আমরা পরের হাত তোলার উপরে দিন কাটাচ্ছি। আমি ওকথা লিখি কেমন করে।

রাগ করে অমল বলল—তুমি হেডস্যারের দয়া মায়া নেই বলছিলে কেন? তোমারও তো দয়া মায়া নেই মা!

—ওরে হতচ্ছাড়া পাজি ছেলে, এ কথা তুই আমাকে বলতে পারলি?

—একশো বার বলব, হাজার বার বলব। নেই তো তোমার দয়া মায়া। বলে রাগ করে ভাতের থালা ঠেলে দিয়ে অমল উঠে চলে গেল।

—ওরে খোকা শোন, শোন, যাসনে বলছি, শুনলি?

পরদিন পাঠশালায় আর শোভান এল না। মতিস্যারও যেন কেমন অন্যমনস্ক। সেদিন সবাইকে সিপাহীযুদ্ধের গল্প শোনাবেন বলে ডেকেছিলেন, কিন্তু সে কথাও তিনি ভুলে গেলেন।

দেবেশ চুপি চুপি অমলকে বলল—মতিস্যার শোভানকে নিয়ে হেডস্যারের কাছে গেছিলেন। হেডস্যার কিন্তু রাজি হন নি। বলেছেন, তিন জনকে ফ্রি করতে স্কুল কমিটি নাকি রাজি হবে না। শুনে মন খারাপ হয়ে গেল অমলের।

এমন সময় দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন নায়েবখুড়ো—ও মাস্টারমশাই, শুনছেন?

চমকে উঠে মতিস্যার বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ বলুন কি বলবেন।

—আমি আপনাকে কিছু বলব না। ছোট মা আপনাকে কিছু বলতে চান।

—নিশ্চয়ই মা, বলুন মা কি বলবেন।

—ছোট মা বলছেন আপনাদের স্কুলে কে এক ছাত্র শোভানের নাকি পড়া বন্ধ হতে বসেছে ?

—হ্যাঁ ছেলেটা মোটেই ভাল ফল করতে পারেনি। ফ্রিসিপ আর পাবে না। খুব গরীব, পয়সা দিয়ে পড়ার ক্ষমতাও নেই!

—ছোট মা তাই বলছেন আপনি যদি ওর হয়ে একটু হেডমাষ্টার মশাইকে বলে দেন যে আমাদের অমল বাবাজির বাবদ কোন ফ্রি সিপ আমরা চাই না সেটা যেন শোভানকেই দেওয়া হয়। এটা ওঁর একান্ত ইচ্ছা।

—এতো মা খুব আনন্দের কথা। নিশ্চই মা আমি হেডমাষ্টার-মশাইকে বলব। ছেলেটা সত্যিই ভাল। ওর পড়া বন্ধ হলে দেশের ক্ষতি।

—আচ্ছা তাই বলবেন। ফলাফল কাল জানাবেন।

কথা শেষ হবার আগেই অমল ভিতর বাড়ির দিকে এক ছুট লাগাল। মার কাছে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে লাফাতে লাগল।—কে বলেছে মা তোমার দয়া মায়া নেই, লক্ষ্মী মা। very good মা।

—আরে ছাড় ছাড় আমাকে ছাড় বলছি। মা ধমকে উঠলেন। —কি করছিস বলতো।

পরদিন দুপুর বেলাই ছোটস্যার এসে নায়েবখুড়োকে জানিয়ে গেলেন হেডমাষ্টার মশাই ছোট মার অনুরোধ রাখতে রাজী হয়েছেন।

স্কুল খুলতে এক সপ্তাহ বাকি। পড়াশোনা নেই কারও। তাই মতিস্যার তাঁর পাঠশালা বন্ধ করে দিয়ে বাড়ি চলে গেলেন। সারাদিন খেলা আর খেলা। সন্ধ্যেবেলা অমল মার কাছে বসে গল্প শুনছিল। এমন সময়ে কে যেন ওদের ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

—কে ওখানে? মা জিজ্ঞাসা করলেন।

কেউ কোন উত্তর দিল না। কিন্তু কেউ যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে তাতে সন্দেহ নেই। মা আবার বললেন—কে তুমি? কি চাই তোমার? কথা বলছ না কেন?

—অমল। কে যেন ডাকল আস্তে।

—দেখ তো খোকা তোর কোন বন্ধু কিনা।

বাইরে এসে অমল দেখল দেবেশ দাঁড়িয়ে আছে।

—কি রে?

—শোভান এসেছে।

—কেন রে?

—ও তোর মাকে প্রণাম করতে চায়।

—ও কই?

—আমাদের পাঠশালার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরে আসছে না।

—কেন রে?

—ও যে মুসলমান। ভিতরে এলে তোর মার যদি অসুবিধা হয়। তুই তোর মাকে একবার বাইরে আসতে বলবি?

মা বাইরে বার হয়ে এলেন—হ্যাঁ খোকা, এই ভর সন্ধ্যেবেলায় বাইরে বার হয়েছিস যে? বাড়ির লোকেরা কি তোকে বকবেন না?

—মা, শোভান এসেছে।

—কেন? সে আবার কেন?

—ও তোমাকে প্রণাম করতে চায়।

—তা কোথায় সে?

—ওতো মুসলমান, তাই ভিতরে আসছে না। যদি তোমাদের অসুবিধা হয় তাই। মা তুমি একবার পাঠশালার কাছে চল না। ও তোমাকে প্রণাম করেই চলে যাবে।

একটু থমকে গেলেন মা। সন্ধ্যা আহ্নিক এখনও হয়নি ওঁর। রাতের জলখাবার ও খাওয়া হয়নি। আর সময় পেল না ছেলেটা। একবার

ভাবলেন ওকে চলে যেতে বলেন। প্রণামের দরকার কি ওঁর। পরক্ষণেই মনে হল দরকারটা হয়তো অন্য পক্ষের। ছেলেমানুষ সময়ের হিসাব বুঝে উঠতে পারেনি। ধর্মকর্ম সে তো মনের ব্যাপার। ছোঁয়াছুঁয়ির বিচারও তো মনের। ও ছেলের বয়স যা তার আবার জাত। তাকে ছুঁলে আবার অশুচি!

—আয়তো আমার সঙ্গে খোকা। কোথায় সে?

দালানের দেওয়ালে হেলান দিয়ে শোভান দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের আসতে দেখে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। মা কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ও নিচু হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। তারপর মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। মা বললেন—হ্যাঁরে শোভান, তুই ভিতরে যাসনি কেন?

—আমি মুসলমান চাচী। আম্মাজান ভিতরে যেতে মানা করে দিয়েছে।

—তা কেমন প্রণাম করলি রে? পায়ে হাত ঠেকল না?

—আম্মাজান যে ছুঁতে মানা করে দিয়েছে।

—তোর আম্মাজানের সব কথা তুই শুনিস?

—হ্যাঁ, চাচী। আমার আম্মাজান ঠিক তোমার মতন।

ওর কথা শুনে হেসে উঠলেন মা। বললেন—আচ্ছা তোরা সবাই বসে একটু গল্প কর আমি এখুনি আসছি। মিষ্টি খেয়ে তারপরে সব বাড়ি যাবি।

মা চলে যেতেই, শোভান বলল—ভাই অমল তোর কথা আমি কোন দিনও ভুলব না। তুই দেখিস আমিও ঠিক একদিন তোর জন্য অনেক কিছু করব। ঠিক করব।

দেবেশ বলল—সে তো সব বন্ধুরাই সব বন্ধুদের জন্য করবে, নইলে আর বন্ধু হল কিসে। এ তুই কি বললি।

শোভান বলল—না রে দেবেশ, আমি এমন কিছু করব যা কেউ করতে পারে না। তুই দেখিস।

স্কুল খুলে গেল। তারপর মতিমাস্টার তাঁর পাঠশালা চালু করলেন। সবই ঠিক আবার আগের মত চলতে লাগল। শুধু অমল লক্ষ্য করল শোভান যেন হঠাৎ বদলে গেছে। যে রোজ ঝগড়া না করে থাকতে পারত না, দুষ্টুমি আর দুরন্তপনায় যে ছিল সেরা, সে যেন হঠাৎ একেবারে অন্য মানুষ। মতিস্যারও একদিন জিজ্ঞাসা করলেন —কি রে শোভান ব্যাপার কি? আজকাল যে তোর নামে আর নালিশ শুনি না!

—না স্যার। আমি আর দুষ্টুমি করব না। ওসব আমি ছেড়ে দিয়েছি।

—হ্যাঁরে, ভাত হজম হবে তো তোর। হেসে জিজ্ঞাসা করলেন মতিস্যার।

—না স্যার, এবারে আর পরীক্ষার ফল খারাপ হলে চলবে না। অমলের কাছে তাহলে আর মুখ দেখাতে পারব না।

একদম বদলে গেল শোভান। কোথায় গেল ওর দুষ্টুমি। কোথায় গেল ওর হৈ হুল্লোড়। শুধু পড়া আর পড়া। পড়াশোনা নিয়ে ক্ষেপে গেল ছেলেটা!

॥ চার ॥

অজ-পাড়াগাঁ কনকপুর। বড় শহর থেকে দূরে। রেল রাস্তা বা পাকা সড়ক, কোনো কিছুর সঙ্গে যোগ নেই। পৃথিবীর খবর এখানে পৌঁছায় অনেক দেরীতে। গরীব গাঁয়ের লোকেরা সারাদিন ব্যস্ত থাকে তাদের নিজেদের দুঃখ কষ্ট নিয়েই। পৃথিবীর অন্য কোন খবরে তাদের কোন কাজ নেই।

সেখানে হঠাৎ একদিন খবর এসে পৌঁছাল জার্মানরা নাকি চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করে নিয়েছে। সে দেশটা যে কোথায় কেউ জানেই না। তা না জানুক, জার্মানরা যে ভীষণ, সেকথা জানে সকলে। স্কুলের অন্য সব ছেলেদের সঙ্গে ম্যাপ খুলে অমলও দেখল দেশটা কোথায়।

দেবেশ বলল—মতিস্যার বলেছে এবারে যুদ্ধ লাগবে।

—কার সঙ্গে কার? কে যেন জিজ্ঞাসা করল।

সে সম্বন্ধে ওদের কারও ঠিক কিছু জানা নেই। সবাই তাই চুপ করেই রইল।

অমল বলল—যুদ্ধ লাগলেই বা আমাদের কি?

—বাঃ। যুদ্ধ লাগলে কি ভীষণ যে সব কাণ্ড হবে। বলল দেবেশ। একথাও ও শুনেছে মতিস্যারের কাছে।

—তাতেই বা আমাদের কি? আবার অমল বলল।

ইতিহাসের পাতায় ওরা যুদ্ধের কথা পড়েছে। এক রাজার সঙ্গে আরেক রাজার। এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের। সে সব কথা ওরা পড়েছে শুধু পরীক্ষায় পাশ করবে বলে। সে সব যুদ্ধের কথা তো ঠিক গল্পের মতো। তেমন যুদ্ধ হলে, কি আর এমন কাণ্ড হবে?

মতিস্যারের কথাটাকে তাই আর কেউ তেমন বড় করে ভাবল না। এমন কি বিকেলের পাঠশালাতেও কেউ সে কথা তুলল না।

কিন্তু অল্প কদিনের মধ্যেই সব কিছু যেন কেমন হঠাৎ বদলে গেল। অজ-পাড়াগাঁ কনকপুরেও এসে পৌঁছাল যুদ্ধের ঢেউ। আমেরিকা আর ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ লেগেছে জার্মান আর জাপানীদের। ভীষণ যুদ্ধ, এমন যুদ্ধের কথা কোন ইতিহাসেই লেখা নেই। হঠাৎ যেন গাঁয়ের সাধারণ মানুষরাও সবজান্তা হয়ে পড়ল। রোজ নতুন খবর আর অদ্ভুত সব গুজব হাওয়ায় ভেসে আসতে লাগল। ইংরেজরা হেরে যাচ্ছে। একটার পর একটা দেশ তাদের হাত থেকে চলে যাচ্ছে। জাপানীরা বর্মা পর্যন্ত এসে গিয়েছে। এবারে ভারতবর্ষের দিকে এগোবে। ওদিকে সারা ইউরোপ জার্মানরা দখল করে নিয়েছে। সেখান থেকে কোনো মতে পালিয়ে বেঁচেছে ইংরাজ সৈন্যরা।

স্কুলের পড়াশোনায় কেমন যেন ঢিলে পড়ে গেল। মতিস্যার তাঁর সন্ধ্যেবেলার পাঠশালায় ম্যাপ খুলে ছেলেদের যুদ্ধের অবস্থা বোঝাতে আরম্ভ করলেন। মতিস্যারও যেন কেমন বদলে গেলেন। কি যেন তাঁর হয়েছে। কি যেন ভাবেন সারাক্ষণ। স্কুলে পাঠশালায় সব জায়গাতেই সব সময় অন্যমনস্ক। শহর থেকে দুদিনের বাসি যে খবর কাগজটা তাঁর কাছে এসে পৌঁছয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন সেটা তিনি। সব যুদ্ধের খবরটুকুই তিনি শুনিয়ে দেন ছেলেদের। ছেলেরা সবাই কিন্তু মনে মনে ভীষণ খুশি। যাক এতদিন পরে বিদেশী ইংরেজ তাদের উচিত সাজা পাচ্ছে।

অমলের মা খালি বলেন—আহা এমন যুদ্ধের কি দরকার বাপু। কত লোক মরছে। কত লোকের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে, বুঝি না এ যুদ্ধে কি লাভ!

এসব কথা শুনে অমল হাসে, বলে—তোমার এসব কথা কে শুনবে মা? আর ইংরেজরা হেরে গেলে ত আমাদের লাভ। আমাদের দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে। মতিস্যার বলেন এ যুদ্ধে ইংরেজরাই হেরে যাবে।

—তোর মতিমাস্টারের ঐ এক কথা, দেশ আর দেশ। কত লোকের যে সর্বনাশ হচ্ছে সে কথা ভাবেন না তিনি ?

এসব কথার কোনো উত্তর দেয় না অমল। যুদ্ধটা যে ঠিক কি, আর কে হারলে যে কার লাভ, এ সব কথা ও খুব ভাল বোঝে না। তবে মতিস্যার যখন বলেছেন দেশ স্বাধীন হলে দেশের ভাল হবে, তখন ও তাই চায়। মতিস্যারের কাছেই তো ও শুনেছে এই দেশের স্বাধীনতার জন্য সারা দেশ জুড়ে কত ছেলেই না হাসিমুখে ফাঁসি গিয়েছে। তাদের কথা শুনতে ওর খুব ভাল লাগে। তারা কি তবে প্রাণ দিয়েছে এমনি এমনি ? শোভান তো বলেছে, বড় হলে ও ক্ষুদিরাম হবে। ঠিক অমনি করে ও-ও দেশের জন্য প্রাণ দেবে ! ও যদি তা পারে, তবে অমলই বা পারবে না কেন ? কেন অমলও দেশের কথা ভাববে না ? মাকে অবশ্য এ সব কথা বলে না অমল। মা ভয় পাবে মিছিমিছি, কান্না কাটি করবে। কিন্তু এতে ও মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে, যদি সময় আসে, যদি সুযোগ আসে, তবে ও-ও দেশের জন্য হাসি মুখে সব কিছু করবে ! শুধু ও কেন, টিফিনের ছুটিতে পুকুর পাড়ে বসে কত দিনই স্কুলের কত ছেলেই তো এমন সব কথাই বলেছে। অবশ্য সবাই নয়। বলেছে তারা যারা রাতে মতিস্যারের পাঠশালায় পড়তে যায়।

মতিস্যারই তো ওদের সবাইকে এমন করে ভাবতে শিখিয়েছেন।

যুদ্ধ ! যুদ্ধ ! যুদ্ধ ! সমস্ত দেশের সব কিছুই যেন কেমন আস্তে আস্তে বদলে যেতে লাগল।

বদলে যেতে লাগল যেন দেশশুদ্ধ মানুষরাও।

জিনিসপত্রের দাম হঠাৎ বাড়তে আরম্ভ করল। শুধু তাই নয়। জিনিসপত্রের অভাব শুরু হয়ে গেল। কেরোসিন তেলের প্রথমে দাম বাড়ল। পরে হঠাৎ বাজার থেকে উধাও হয়ে গেল। তেলের হল কি ? জিজ্ঞাসা করলে দোকানদার বলতে শুরু করল—তেল যুদ্ধে গেছে।

মতিস্থার তাঁর রাতের পাঠশালা বিকেলে শুরু করে দিলেন। অন্ধকার হবার আগেই পড়া বন্ধ। তখন শুধু বসে বসে মতিস্যারের কাছে দেশের গল্প শোনা, যুদ্ধের গল্প শোনা। এমন দিনে সারা দেশকে অবাক করে দিয়ে সুভাষ বসু ইংরেজদের নাকের সামনে দিয়ে দেশ ছেড়ে জার্মানিতে চলে গেলেন।

মতিস্যারের কাছে ওরা শুনতে পেল। সুভাষবাবু জার্মানি থেকে বেতারে কথা বলেছেন। দেশের লোককে বলেছেন, তিনি এসেছেন, শুধু ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য। দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ করে যাবেন।

মতিস্যার বললেন—তোমরাও শোন। এবারে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেবার সময় এসেছে। তোমরা তৈরী হও। যেদিন ডাক আসবে আমাদেরও ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

শোভান থাকতে না পেরে বলল—কিন্তু স্যার আমরা বন্দুক পাব কোথায়? কি দিয়ে আমরা লড়ব?

—তোমরা তোমাদের মনকে আগে তৈরী কর। ঠিক সময়ে অস্ত্র এসে যাবে। অস্ত্র দেবেন সুভাষ বসু।

শোভান বলল—আমরাও তৈরী স্যার। মরতে আমরা কেউই ভয় পাই না।

সেই দিনই মতিস্যার এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন। বললেন —তোমাদের মুখের কথাকে আমি অবিশ্বাস করি না। তবুও তোমাদের যাদের সাহস আছে চল তারা বাইরে। দেশের মাটি ছুঁয়ে তাদের আজ প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে দরকার পড়লে এ দেশের জন্য তারা প্রাণ দেবে। চল দেখি কার বুকে সাহস আছে।

সবার আগে এগলো শোভান। তারপর দেবেশ। হঠাৎ অমলের খেয়াল হল। অন্য আরও অনেকের সঙ্গে সে-ও এসে দাঁড়িয়েছে বাড়ির বাইরে!

সবাই এক এক করে মাটি ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করল। সবাইকেই

এক এক করে বুকে টেনে নিলেন মতিস্যার। দুচোখে ওঁর জল! সারা মুখে ওঁর যেন কেমন একটা অদ্ভুত আনন্দের ছাপ। বললেন—আর আমাদের এক মুহূর্তও নষ্ট করার মত সময় নেই। নিজেদের প্রস্তুত করার জন্যে এখন আমাদের অনেক কিছুই করতে হবে। কিন্তু তার আগে সবাইকেই আরও প্রতিজ্ঞা করতে হবে আজ এই মুহূর্ত থেকে এ সম্বন্ধে কোনো কথা কেউ কাউকেই বলতে পারবে না। এমন কি আপন মা বাবা ভাই বোনকেও না।

সবাই সেই প্রতিজ্ঞা করল।

॥ পাঁচ ॥

এত সব গোলমালের মধ্যে দিয়েই কখন যে দুটো বছর কেটে গেছে, কখন যে দুটো ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গিয়ে ওরা আরও দু ক্লাস উঁচুতে উঠে গেছে তা আর ওদের মনেও নেই। কে ফার্স্ট হল, কে সেকেণ্ড, তা নিয়েও কেউ তত ভাবেনি। ওরা ব্যস্ত তখন নিজেদের তৈরী করা নিয়ে। লুকিয়ে ভাগাড়ের মাঠে গিয়ে ড্রিল প্যারেড করা। দৌড় ঝাঁপ দিয়ে শরীরকে মজবুত করা। আর সন্ধ্যেবেলা মতিস্যারের কাছে গিয়ে লুকিয়ে বাজেয়াপ্ত বই পড়ে, তা নিয়ে আলোচনা করা।

অমল গাঁয়ের ছেলে হয়ে গিয়েছে। কলকাতার কথা আর ওর মনেও পড়ে না। এখন আর ওর মা ওকে একলা ছাড়তেও ভয় পান না। ও আর অন্য সবার মতোই একা চলাফেরা করে। পড়াশুনায় ও তেমনি আছে। শুধু একটু বেশিরকম গম্ভীর হয়ে পড়েছে। দেশের জন্য কাজ করবে ও। ওকে কি বেশি হৈ চৈ করলে চলে?

একদিন ছুটির সকালে মতিস্যার ওদের বাড়িতে এসে হাজির। ডাকাডাকিতে অমল বাইরে বার হয়ে এসে মতিস্যারকে দেখে একটু অবাক হল।

—শোন একটা জরুরী কাজ করতে হবে তোমাকে। তোমার খাওয়া হয়েছে?

—না স্যার।

—তাড়াতাড়ি স্নান খাওয়া সেরে এসো। আমি স্কুলে আছি। মাকে বলে আসবে তোমার ফিরতে একটু দেরি হবে। মতিস্যার আর দাঁড়ালেন না। সাইকেলে উঠে সোজা চলে গেলেন।

তাড়াতাড়ি স্নান খাওয়া সেরে অমল স্কুলে গিয়ে দেখল শোভানও দাঁড়িয়ে আছে।

—মতিস্যার কোথায় রে? ও জিজ্ঞাসা করল।

—উনি আসবেন এখুনি। আমাদের দাঁড়াতে বলে গেছেন।

—কেন ডেকেছেন কিছু জানিস তুই?

—না তো। তোকে কিছু বলেন নি?

—না।

খেলার মাঠের ধারে মতিস্যারকে আসতে দেখে ওরা এগলো সে দিকে। সাইকেল থেকে নেমে মতিস্যার বললেন—তোমাদের এখুনি একবার ছত্রপুরে যেতে হবে। সেখানে কলকাতা থেকে প্রফেসর পাকড়াশী এসেছেন। তাঁকে আমার এই চিঠিখানা দেবে। দিয়ে উত্তর নিয়ে আসবে। আমিই যেতাম কিন্তু আমাকে এখুনি যেতে হবে হেতমপুরগঞ্জে। সেখানে কাল ভয়ানক গোলমাল হয়ে গিয়েছে। গোলাদার সা মশাইদের গোলার ধান লুট হয়ে গেছে। ব্যাপারটা কি আমার দেখে আসা দরকার।

অমল বলল—ছত্রপুর তো স্যার বহুদূরে।

—হ্যাঁ জানি। শোভান তোমাকে মেঠোপথে নিয়ে যাবে। ফিরতে বিকেল গড়িয়ে যাবে। আর দেরী কর না। তোমরা রওনা হয়ে যাও। চিঠিখানা নিয়ে অমল পকেটে রাখল যত্ন করে।

শোভান ডাকল—আয় অমল। আমরা চলি স্যার।

গ্রাম ছাড়িয়ে মেঠো পথ ধরে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ওরা মামুদপুরের কাঁচা রাস্তার উপরে উঠল। রাস্তায় উঠে ওরা অবাক হয়ে গেল। একি ব্যাপার চলছে এখানে? সারা রাস্তা জুড়ে ইঁট বিছানো। বিহারী কুলিরা তার উপরে খোয়া পিটাচ্ছে। দূরে দুটো স্টিম রোলার ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এগোচ্ছে পিছোচ্ছে। পিচের গন্ধে সারা তল্লাট ভরা। একজনকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল—কোন দেশের মানুষ তোমরা? জানো না, মামুদপুর থেকে হেতমপুর-

গঞ্জ পর্যন্ত পাকা রাস্তা বসছে। মিলিটারী কনভয় চলবে এ রাস্তা দিয়ে। গাঁয়ে থেকে একথা তো ওরা কোন দিনও শোনেনি। অবাক ওরা আর দাঁড়াল না। রাস্তা পার হয়ে ঢালু জমির শেষে নেমে দেখল বিরাট ক্যাম্প পড়েছে।

রাস্তার কাজের লোকদের ক্যাম্প। কত জিনিস কত যন্ত্রপাতি। আরও অবাক হয়ে দেখল ক্যাম্পের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরা একদল হাড় বার করা ছেলে মেয়ে বুড়ো! হাতের বাসনটা তারা ক্যাম্পের দরজার সামনে ধরে চেঁচাচ্ছে—বাবা দুদিন কিছু খেতে পাইনি, বাবা।

—ওরা কে রে শোভান? অমল জিজ্ঞাসা করল।

—চলে আয়, অমল। ডাকল শোভান—ওরা গাঁয়ের লোক। তুই জানিস না দেশ থেকে ধান চাল সব সরকার সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কত লোক না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে।

—কেন? অবাক হয়ে অমল জিজ্ঞাসা করল।

—লোকে বলে জাপানীরা এদেশ দখল করে নেবে, তাই সরকার সব ধান সরিয়ে নিচ্ছে। কেউ বলে এ সব খাবার যাচ্ছে যুদ্ধে। সেপাইদের খাওয়াবার জন্য।

—দু মুঠো খেতে দাও বাবা। ক দিন কিছু খাইনি। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল। ব্যস্ত হয়ে শোভান বলল—তুই এলি অমল? আমাদের কত দূর যেতে হবে তা খেয়াল আছে তোর?

—ওদের দেখলে বড় দুঃখ হয় রে?

—দুঃখ করে লাভ? ওদের জন্যই দেশকে স্বাধীন করতে হবে। নইলে শুধু দুঃখ করলে কি ওদের পেট ভরবে?

ওরা এগলো। যেখানে গেল যে দিকে গেল, সব দিকে দেখল, হাজার হাজার মানুষ ঘর বাড়ি ছেড়ে পথে নেমে এসেছে দলে দলে। বাচ্চা বুড়ো ছেলে মেয়ে সবাই। না খেয়ে খেয়ে

হাড্ডিসার চেহারা। সবাই চেঁচাচ্ছে, একটু খেতে দাও বাবা। একটু ফ্যান দাও মা!

ভয় পেয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে ওরা ছত্রপুরে এসে পৌঁছাল যখন তখন বেলা দুপুর। এদিকে ছত্রপুর বড় জায়গা। স্কুল পোষ্ট-অফিস আছে। ছোট একটা হাসপাতালও আছে। আর আছে বড় বড় সব আড়ত। চালের আড়ত ধানের আড়ত। লোকজনও অনেক বাস করে এখানে। তাদের অনেকেই বড় ব্যবসায়ী। অনেক পয়সা আছে তাদের। হেতমপুরগঞ্জের মতন অত বড় না হলেও ছত্রপুর এ অঞ্চলে বড় জায়গা।

একটু খুঁজেই ওরা প্রফেসার পাকড়াশীর বাড়ি পেয়ে গেল। ছোট্ট পোড়ো বাড়ি বহুদিন মেরামত করা হয় না। চুন বালি খসে খসে পড়েছে বাড়িটার। শোভান এগিয়ে গিয়ে বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিল। একবার দুবার তিন বার। ভিতর থেকে কেউ সাড়া দিল না।—কেউ নেই নাকি? ও বলল।

—বুঝতে পারছি না তো। স্যার কি না জেনেই আমাদের পাঠিয়েছেন?

—তা হতে পারে না।

আবারও খুব জোরে দরজায় ধাক্কা দিল শোভান। দরজাটা তাতে নড়বড় করে উঠল। উপর থেকে চুন বালি খসে পড়ল।

—কে? ভিতর থেকে কাঁপা সরু গলায় কে যেন জিজ্ঞাসা করল।

—প্রফেসার পাকড়াশী আছেন?

একটু পরেই খট করে দরজাটা খুলে গেল। এক বৃদ্ধ এসে সামনে দাঁড়ালেন।—কাকে চাই?

—প্রফেসার পাকড়াশীকে। বলল অমল।

—কাকে? অবাক হয়ে বৃদ্ধ আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

—প্রফেসার পাকড়াশীকে। তিনি কি আছেন?

—ও নামে তো আজকাল আমাকে কেউ ডাকে না। অবাক হয়ে প্রফেসার বললেন—তোমরা কোথা থেকে আসছ ?

—কনকপুর থেকে। কনকপুর স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার মতি-স্যারের কাছ থেকে। আপনার একটা চিঠি আছে।

—এসো, ভিতরে এসো। মতি ভাল আছে তো ?

—হ্যাঁ তিনি ভাল আছেন।

ওরা ভাঙ্গা দালান পার হয়ে অন্ধকার এঁদো একটা ঘরের মধ্যে ঢুকল। একপাশে একটা পুরনো খাট পাতা, তার উপরে ময়লা ছেঁড়া বিছানা। আর এক দিকে একটা কাচভাঙ্গা আলমারি ভর্তি বই। অন্য পাশে দুটো হাতলভাঙ্গা চেয়ার। সেই দুটো দেখিয়ে দিয়ে প্রফেসার বললেন—বস তোমরা। হেঁটে আসছ, ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই। দাঁড়াও, আগে তোমাদের জন্যে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করে আসি। তারপর কথা হবে। কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে চলে গেলেন তিনি। ফিরে এসে বিছানার উপরে কাত হয়ে শুয়ে বললেন—কই দাও চিঠিখানা দেখি।

মন দিয়ে বেশ কয়েকবার চিঠিখানা পড়লেন উনি। পড়া হলে ভাঁজ করে ওটা রেখে দিলেন বিছানার তলায়। কি যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ তারপর উঠে আলমারি থেকে দোয়াত কলম বার করে কাঁপা হাতে উত্তর লিখতে শুরু করে দিলেন। লেখা শেষ করে ওটা ভাঁজ করে শোভানের হাতে দিয়ে বললেন—খাম তো নেই বাবা, এটা তাই বন্ধ করে দিতে পারলাম না। এটা তোমরা পড়বে না। সোজা নিয়ে গিয়ে মতির হাতে দেবে। বুঝলে ?

—আচ্ছা। বলে শোভান মাথা নাড়ল।

—জান বাবা, অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট ডেভিডকে গুলি করার জন্ম আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল! সে আজ কত বছর হয়ে গেল। বরাৎ খারাপ তাই ফাঁসি হল না। আন্দামানে পাঠিয়ে দিল। সেখান থেকে ফিরেছি তাও কতদিন আগে। এখন আর আমাকে কেউ

চিনতে পারে না। তার উপর বুড়ো হয়ে পড়েছি। তা মতিকে বলবে ওর যদি কোন কাজে আসতে পারি তো আমি খুশিই হব। তবে বাবা আমার অবস্থা ত দেখতেই পাচ্ছ। চাঁদা টাদা চাইলে কিন্তু আমি এক কানা কড়িও দিতে পারব না তাও বলে দিও মতিকে। চাঁদার ব্যাপার হলে সে যেন অন্য লোক খোঁজে।

ছত্রপুরের বিখ্যাত ছানার মিষ্টি পেট ভরে খেয়ে ওরা আবার ছুটল বাড়ির দিকে। সন্ধ্যে নাগাদ গাঁয়ে পৌঁছে দেখল মতিস্যার তখনও গঞ্জ থেকে ফেরেন নি। সারা পথ যা ওরা দেখে এসেছে, তা বলার নয়। তার উপরে গঞ্জে চালের গুদাম লুট হয়ে গেছে। মতিস্যার কোন রকম বিপদে পড়লেন না তো! ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওরা।

শোভান বলল—তুই বাড়ি চলে যা অমল। চাচীজী নইলে ভাববেন। চিঠিটা নিয়ে আমি কিচ্ছুক্ষণ অপেক্ষা করব। আজ যদি নাও আসেন উনি তো কাল সকালেই যেমন করে হোক আসবেন। এ চিঠি আমি তখন ওঁকে দেব।

সারা দিন বাড়ির বাইরে! মা যে ভাবছেন তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না অমলের। বলল—বেশ আমি যাচ্ছি। কাল সকালেই তুই আমাকে ডাকবি।

শোভান বলল—আচ্ছা।

বাড়ির অর্ধেক পথ আসতেই অমল দেখল লণ্ঠন হাতে সুলেমান চাচা ব্যস্ত হয়ে আসছে।

—কোথায় গেছিলে বাপজান? সন্ধ্যে থেকে সারা গাঁ আমি তোমাকে খুঁজে মরছি। মাঠান ঘরবার করছেন। একটুও আক্কেল হুঁস নেই তোমার? এমন করে?

—চল চাচা, বাড়ি চল।

—আমার ভয়ানক রাগ হয়েছে বাপজান। এমনটি তুমি আর কোনো দিন করবে না। মার কথা তো ভাববে?

বাড়ির ফটকের কাছেই মা দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন—হ্যাঁরে খোকা এতটুকুও দয়ামায়া নেই তোর? সারা দিন কোথায় ছিলি তুই?

—চল মা ঘরে চল। বড় ক্ষিদে পেয়েছে আমার। খেতে বসে অমলের হঠাৎ মনে পড়ল ঐ সব অসহায় লোকগুলোর কথা। সারা পথ যাদের দেখে এসেছে আজ ও। একমুঠো একটু ভাতের খোঁজে যারা সব কিছু ছেড়ে পথে বার হয়ে পড়েছে।

—মা আমার খেতে ভাল লাগছে না।

—কেন রে? শরীর খারাপ হয়নি তো তোর? সারাদিন টো টো করে রদ্দুরে ঘুরেছিস।

—না মা। আজ কি দেখে এসেছি, জান?

—কি দেখেছিস রে?

—যুদ্ধের জন্য সারা দেশ গাঁ থেকে চাল গভর্ণমেণ্ট নিয়ে নিয়েছে। না খেতে পেয়ে লোকরা ঘর বাড়ি ছেড়ে ভিক্ষে করতে বেরিয়ে পড়েছে। কি তাদের চেহারা! কত দিন যে তারা খেতে পায়নি!

—হ্যাঁ, নায়েবমশাই বলছিলেন চালের দাম হু হু করে বেড়ে চলেছে। পাওয়াও যাচ্ছে না সব দিন। কি দিন কাল পড়ল। এমন যুদ্ধ মানুষেও করে!

—আমাদের গাঁয়ের মধ্যে বসে থেকে মানুষের এমন দুঃখের কথা আমি জানতাম না মা। কই? এ গাঁয়ে তো ভাত ভিক্ষে করতে কেউ কোন দিন আসেনি।

—কি জানি, ওরা হয়তো বড় রাস্তা ধরে বড় শহরের দিকে চলে যাচ্ছে, তাই আসেনি।

—দু গ্রাস ভাত কোনো মতে খেয়ে অমল বলল—মা আমাদের হবে কি? চাল না পাওয়া গেলে আমাদের চলবে কেমন করে?

—তুই ভাবিস না। মা বললেন—প্রতি বছর যে ধান আমরা

বিক্রি করে দিতাম এবারে তা বিক্রি করতে মানা করেছি আমি। কষ্টে স্বষ্টে আমাদের চলে যাবে।

খেয়ে উঠে আর দাঁড়াতে পারল না অমল। সারা শরীর ওর ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ছে। সোজা তাই ও চলে গেল শুতে। বিছানায় শুয়ে কিন্তু ওর ঘুম মোটেই এল না। চোখ বুজলেই চোখের সামনে সেই সব অদ্ভুত লোকগুলোর ছবি ভেসে আসতে লাগল। কানে যেন ও স্পষ্ট শুনতে পেল সেই বীভৎস চিৎকার—দু মুঠো ভাত দে মা। দুদিন কিচ্ছু খাইনি!

এ দেশে আজ বিদেশী সরকার। তাই সে সরকার এমন করে মানুষগুলোকে না খেতে দিয়ে, পথে ঠেলে দিতে পেরেছে! এ সরকারকে তাড়াতে হবে। এ দেশকে স্বাধীন করতে হবে। তা না করতে পারলে তো ঐ সব মানুষগুলোকে পেট ভরে খেতে দিতে পারা যাবে না।

বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ ছটফট করল অমল। তারপর এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালেই শোভান এসে ডাকল ওকে—মতি স্যার তখনও ফেরেননি গঞ্জ থেকে। ফিরলেন অনেক বেলায় সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে। দেখল অমল, স্যারের জামা কাপড় ছেঁড়া। মুখে, চোখের কোলে, আঘাতের চিহ্ন। দেখে ভয় পেল ও—কি হয়েছে স্যার?

—ভীষণ সব কাণ্ড হয়ে গেছে গঞ্জে। পুলিস এসেছিল, বহু লোককে ধরে নিয়ে গেছে। লোকেরা ক্ষেপে ওঠাতে, লাঠি চালিয়েছিল পুলিস। বহু লোক আহতও হয়েছে। আমারও চোট লেগেছে। সে কথা যাক। তোমরা গেছিলে প্রফেসার পাকড়াশীর কাছে?

—হ্যাঁ। তিনি চিঠি দিয়েছেন।

চিঠিটা হাতে নিয়ে উনি বললেন—শোভান আমি এখুনি ছত্রপুরে চলে যাচ্ছি। আমি কোথায় গেছি একথা কাউকে বলবি না।

বললে বিপদ হবে। পারলে আমার বাড়িতে একটা খবর দিয়ে দিস। বলিস আমি কাজে বাইরে গেছি। ফিরতে কদিন দেরী হবে। দিনকতক এখন আমাকে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে।

শোভান বলল—আমাদের সঙ্গেও কি আর দেখা হবে না স্যার?

—না, আপাততঃ কয়েকদিন নয়। দেশের যা অবস্থা এখন আমাদের আর চুপ করে বসে থাকা চলবে না। কিছু একটা করতেই হবে। আর তা তাড়াতাড়ি। কি করব সে কথা ঠিক করে আমিই তোদের জানাব। ততদিন চুপ করে থাকিস ভাই।

সাইকেল ঠেলে মতিস্যার খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন, বললেন—শুনেছিস সুভাষ বোস জাপান থেকে কি বলেছেন? বলেছেন, আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।

যেমন এসেছিলেন মতিস্যার তেমনি হঠাৎ চলে গেলেন। ওঁর যাবার পথের দিকে তাকিয়ে থেকে শোভান বলল—আমার কিন্তু একটুও ভাল লাগছে না অমল, ভীষণ কিছু একটা হতে চলেছে। তুই দেখিস। নইলে স্যার অমন করে রক্তের কথা বলে গেলেন কেন?

স্কুলের তাড়া আছে। তাই অমল ফিরল বাড়ি। শোভানও চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল—স্কুল ছুটির পরেই ও চলে যাবে মতিস্যারের বাড়িতে খবর দিতে। আজ আর ওর রাতে বাড়ি ফেরা হবে না।

রোজকার মতো স্কুল বসল। মতিস্যারের পিরিয়ডে অঙ্কের মাস্টারমশাই ক্লাস নিলেন। কি হয়েছে মতিস্যারের কেউ কিচ্ছু জানতেই পারল না। টিফিনের পর স্কুল বোসতেই গঞ্জের থানার দারোগাসাহেব দুজন সেপাইকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলে এলেন। সোজা তিনি চলে গেলেন হেডস্যারের ঘরে। সে ঘরের দরজার সামনে অনেকেই তখন ভিড় করে দাঁড়াল। কি ব্যাপার জানবে বলে।

অমল আর শোভানও গিয়ে দাঁড়াল সেখানে। ওরা যা ভেবেছে ঠিক তাই। দারোগা মতিস্যারের খোঁজ নিতে শুরু করলেন। কোথায় থাকেন। কোথায় যান। কাদের সঙ্গে মেলামেশা করেন এই সব কথা।

হেডস্যার বিরক্ত হয়ে বললেন—তিনি মতিমাস্টারের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কোনো কিছুই জানেন না। উনি যোগ্য শিক্ষক, এবং অত্যন্ত সুনামের সঙ্গেই আপনার কর্তব্য করেন। একথা ছাড়া ওঁর আর বলার মত কিছুই নেই।

দারোগাসাহেবও বিরক্ত হয়ে বললেন—ওঁর নামে ওয়ারেন্ট আছে। তাঁকে কাল বাড়িতে পাওয়া যায় নি। আজও তিনি স্কুলে আসেন নি। তিনি ফেরার হয়েছেন।

শোভানকে ডেকে নিয়ে অমল চলে এল পুকুর ধারে। বলল—শোভান তুই আর মতিস্যারের বাড়িতে যাস না। গেলে হয়ত বিপদে পড়বি।

—কেন? শোভান জিজ্ঞাসা করল।

—যদি ওখানে পুলিশ যায় আর তোকে ধরে ফেলে তো তোর কাছ থেকেই মতিস্যারের খবর পেয়ে যাবে। মতিস্যারও ধরা পড়ে যাবেন।

—তাহলে আমি কি করব?

—এখন কিছুদিন চুপ করে থাক। পরে নয় কি করবি ভেবে দেখব।

—বেশ, তুই যখন বলছিস। কিন্তু মতিস্যার করেছেন কি? কেন তাঁকে ধরতে পুলিশ এলো?

—এতো সোজা কথা। মতিস্যার হেতমপুর গঞ্জে স্বদেশী করেছেন তাই তাঁকে ধরবে বলে পুলিশ ঘুরছে।

ওরা পুকুর ধার থেকে ফিরল। পুলিশ দারোগা তখন চলে গেছে। ওদের দেখতে পেয়ে দেবেশ এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল—ব্যাপার কি রে? পুলিশ কেন?

শোভান কিছু বলার আগেই অমল উত্তর দিল—আমরাও কিছু বুঝতে পারছি না। মতিস্যার যে কি করলেন!

আরও কয়েকটা মাস কেটে গেল। মতিস্যারের কোনও খবর নেই। ছোট কালিকাপুরের লোকদের মুখে ওরা শুনল পুলিশ সেখানে মতিস্যারের বাড়িতে রোজ আসা যাওয়া করছে। মতিস্যারের বুড়ি মাকে ভয় দেখাচ্ছে।

শোভান বলল—ভাগ্যিস আমি যাইনি ওখানে। গেলে তো বিপদ হত!

॥ ছয় ॥

বিপদ কিন্তু এল অন্য দিক দিয়ে। চালের অভাব চারদিকে শুরু হয়ে গেল। কনকপুরের গরীবদের ঘরেও অনাহার শুরু হল। শুধু কি তাই? ভিন গাঁয়ের লোকেরা ছমুঠো ভাতের আশায় শেষ পর্যন্ত দলে দলে এসে হাজির হল কনকপুরে। সবার বাড়ির দরজার সামনেই রোজ সকাল থেকে তারা চেঁচাতে শুরু করল—একটু ফ্যান দাও মা। একটু ফ্যান। কদিন কিছু খাইনি। কনকপুরের লোকদেরই তখন খাওয়া জোটে না, তারা আবার দেবে কোথা থেকে? ভীষণ কাণ্ড শুরু হয়ে গেল সারা দেশ জুড়ে। স্কুলের গরীব ছাত্ররা আসা বন্ধ করে দিল। ক্লাসের ছাত্র গেল কমে। যারা আসে, তারাও অনেকে পেট ভরে খেতে পায় না। কেউ শাকপাতা খেতে লাগল। পুকুরের গুগলি ঝিনুকও বাদ গেল না। নানা অসুখ শুরু হল দিকে দিকে।

এমন সময় কারা যেন খবর আনল, গঞ্জ থেকে মামুদপুর অবধি যে পাকা রাস্তা হয়েছে সে রাস্তা দিয়ে সারাদিন রাত বড় বড় লরি বোঝাই হয়ে বস্তা বস্তা চাল চালান যাচ্ছে মামুদপুরের স্টেশনে। সেখান থেকে চাল রেলে বোঝাই হয়ে যাচ্ছে যুদ্ধে!

সুভাষ বোস কি করছেন? একদিন শোভান বলল—তিনি কবে আমাদের যুদ্ধ করতে ডাকবেন? দেশের সব মানুষই যদি না খেয়ে মরে যায় তবে কার জন্য তিনি দেশ স্বাধীন করবেন? আর মতিস্যারই বা কোথায় গেলেন?

অমল বলল—তাঁরা তাঁদের কাজ ঠিকই করবেন সময় হলে। কিন্তু এমন দিনে আমরা কি কিছুই করতে পারি না?

—কি করতে পারি আমরা বল? তুই যা করতে বলবি, আমি তাই করব। এমন করে না খেয়ে মরতে আমারও রে ঘেন্না হয়।

অমল বলল—আমারও। কিন্তু হুট করে কিছু করে লাভ নেই। দুদিন ভাবতে হবে আমরা কি করতে পারি।

দেবেশ বলল—আমার বাবা বলেছেন গঞ্জে নাকি সরকারি লঙ্গরখানা বসেছে। সেখানে ঘ্যাট রান্না করে রোজই লোকদের খেতে দেওয়া হয়। এ গাঁয়ে আমরা তাই করিনা কেন?

—করব যে, কিন্তু চাল পাব কোথায়?

—তোদের তো অনেক ধান জমা করা আছে। তাই দে না কেন? লোকে বাঁচুক। বলল দেবেশ।

শোভান বলল—হারু নন্দী মশাইদের গোলাতেও অনেক ধান আছে আমরা জানি। ওকেও আমরা কিছু দিতে বলব।

অমল বলল—মন্দ বলিস নি তো, চল এখনই মার কাছে যাই। মা না বললে তো নায়েবখুড়ো কিছুই দেবেন না।

মা সব শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরে বললেন—ধান চালের অভাব সব দিকেই। আমারটা আমি দিয়ে দিলে খাব কি? তাছাড়া সব ধান তো আমার একার নয়। বড় তরফেরও তো ধান আছে এতে। তাদের হুকুম ছাড়া একা কিছু করতে পারি না।

শোভান বলল—চাচী দেশ শুদ্ধ লোক মরে যাবে আর তোমরা একলা খাবে! তাদের কথা ভাববে না?

—এমন করে বলিস না বাবা। আমি তো দেখছি রোজ কি সর্বনাশ হচ্ছে। কিন্তু···

অমল বলল—মা, মরতে হয় তো দেশের আর সবার সঙ্গে নয় আমরাও না খেয়ে মরব। তুমি হুকুম দাও মা যে কয়জনকে পারি আমরা খেতে দি।

বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন নায়েবখুড়ো। মা বললেন—খুলে দিন ধানের গোলা আপনি। ভগবান কপালে যা লিখেছেন তাই নয় হবে আমাদের। গুদাম থেকে বার হল বড় বড় হাণ্ডি কড়া বালতি। চৌধুরী বাড়ির ফটকের সামনে গর্ত খুঁড়ে বানানো হল

চুল্লি। আম বাগানের ১০০ বছরের পুরনো বড় একটা আম গাছকে কেটে ফেলা হল। শোভান অমল দেবেশ আর এক পাল স্কুলের ছেলে ছুটে গেল সেখানে। পূজা পাঠ ফেলে এগিয়ে এলেন মা নিজে। রাঁধা ভাত দু হাত ভরে নিয়ে, সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। খবর রটে গেল দেখতে দেখতে—চৌধুরীরা লঙ্গরখানা খুলছে। সন্ধ্যেবেলা মা বললেন—কাণ্ড তো বাধালি তোরা বেশ। এখন এই সৃষ্টির কাজ দেখে কে বলতো? আমি একা আর কতদিক দেখব। লোক না থাকলে এ কাজ চলে?

শোভান বলল—তার জন্য ভাবছ তুমি, চাচী? লোকের আবার অভাব। দাঁড়াও, আমি লোকের ব্যবস্থা করছি। বলে সন্ধ্যের অন্ধকারে ও ছুটে চলে গেল।

মা ব্যস্ত হয়ে বললেন—ওরে দেখ দেখ, এতো রাতে ছেলেটা আবার গেল কোথায়?

সুলেমান হেসে বলল—মিছে ওর জন্য ভাবেন মা-ঠান! ও দস্যি, ঠিক ভোরেই এসে হাজির হবে, দেখবেন।

ঠিক কাক ডাকা ভোরেই শোভান হাজির—ও চাচী। চাচী।

মালা জপ করছিলেন মা। কপালে মালা ঠেকিয়ে মালা রেখে বারান্দায় বার হয়ে এলেন।

—লোক নিয়ে এসেছি চাচী। এবারে তোমার খাটুনি কমবে। সামনে দাঁড়াল একজন মাঝবয়সী গ্রাম্য মহিলা। দূরে দাঁড়িয়েই মাথা ঝুঁকিয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে মাকে প্রণাম জানাল সে।

শোভান বলল—আমার আম্মাজান, চাচী।

মা হাসবেন কি কাঁদবেন ভেবে পেলেন না। রাগ হল ওঁর—ওরে পাজি, এই বুদ্ধি হল তোর। বুড়ি মাকে ধরে আনলি ভূতের বেগার খাটতে।

আম্মাজান বলল—তাতে কি হয়েছে রাণীমা। আমারও দুবেলা জোটে না। এখানে দুটো খাব আর পড়ে থাকব। তুমি কিছু ভেব না।

সুলেমান বলল—যেমন বেটা, আর তেমনি মা। ওদের সঙ্গে আপনি পারবেন না মাঠান। তার থেকে চাল বার করে দিন আমরা কালকের মতন লেগে যাই কাজে।

কোথা দিয়ে যে দিনটা কেটে গেল কেউই বুঝতে পারল না। সন্ধ্যেবেলা বারান্দার এক ধারে শুয়ে পড়ল শোভান। ওর পাশে এসে বসল অমল দেবেশ আর স্কুলের অন্য ছেলেরা। কারও তখন আর কথা বলার অবস্থা নেই। সুলেমানও এসে বসল একটু দূরে।

সেরেস্তায় নায়েবখুড়ো তামাক খাচ্ছিলেন। হুঁকো টানা বন্ধ রেখে দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললেন—উঁহু, উঁহু। এত খাটাখাটানির পর অমন করে মেঝেতে শুয়ো না তোমরা, ঠাণ্ডা লেগে যাবে। শুতে হয় তো সেরেস্তার ফরাসে এসে শোও। বলে আবার গিয়ে তামাক টানা শুরু করলেন।

শোভান তড়াক করে উঠে বসল! বাইরে তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। লোকজনের সাড়াও কমে এসেছে। মা আলো হাতে নিয়ে পাঠশালার ঘরে আম্মাজান আর শোভানের জন্য বিছানা পাতছেন।

এমন সময়ে সুলেমান চেঁচিয়ে উঠল—কে রে ওখানে? বলে লাফ দিয়ে উঠে অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা লোকের গলা ধরে টেনে আনল। ছেঁড়া একটা জামা পরা হাড় বার করা লোক। ওর অবস্থা দেখেই ওকে ছেড়ে দিল সুলেমান। —কি চাও ভাই? ও জিজ্ঞাসা করল—সারাদিন কোথায় ছিলে? লঙ্গরখানা তো বন্ধ হয়েছে সেই বিকেলে, এখন কিছু মিলবে না। কাল সকালে এসো।

লোকটা যেন কেমন করে বলল—আজ্ঞে খেয়েছি আজ। কিন্তু এই কাগজটা এক ভদ্দর লোক দিয়ে গেলেন। এই এটা, বলে একটা ভাঁজ করা কাগজ এগিয়ে ধরল লোকটা।

—কই দেখি। বলে অমল তাড়াতাড়ি কাগজটা নিয়ে, সোজা চলে গেল পাঠশালার দিকে, সেখানে আলো জ্বেলে মা বিছানা পাতছিলেন। আলোর সামনে কাগজটা খুলে ধরে পড়ল—

'তোমাদের প্রতিজ্ঞার কথা নিশ্চয়ই ভোল নি। সে প্রতিজ্ঞা রাখার সময় এসেছে আজ। সুভাষ বোস তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে দেশের শত্রু ইংরেজের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করার জন্য প্রস্তুত। আমাদের এই যুদ্ধে সামিল হতে হবে। ডাকা মাত্রই যেন তোমাদের পাই।'

বুকের ভিতরের সমস্ত রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল অমলের। তাড়াতাড়ি চিঠির বাকি অংশটুকু পড়ল—'মনে রেখো, শুধু তুমি বা তোমার বন্ধুকে হলেই আমার চলবে না। তোমাদের সবাইকেই আজ আমার দরকার। তাদের এ কাজে ডেকে আনার ভার আমি তোমাদেরই দিলাম। সবাই যেন প্রস্তুত থাকে। গোপনতা বজায় রাখবে, নইলে সমূহ বিপদ হবে। ইতি।'

এ চিঠি মতি মাস্টারের! ডাক এসেছে! যুদ্ধের ডাক! 'তুমি বুকের রক্ত দাও, আমি স্বাধীনতা দেব।'

যে লোকটা চিঠিটা এনেছিল সে চলে গেছে। চিঠিটা কে লিখেছে কাকে লিখেছে কিছুই লেখা নেই। এর কথাগুলো বুঝতে অমলের একটুকুও দেরি হল না। ভাঁজ করে চিঠিটা পকেটে রেখে ফিরে গেল দলের অন্য সবার কাছে।

মা জিজ্ঞাসা করলেন—কার চিঠিরে?

—ও কিছু না মা। বলল অমল।

কিন্তু শোভান যখন জিজ্ঞাসা করল—কিরে কার চিঠিরে ওটা?

অমল বলল—তোর চিঠি। নে পড়।

রাত হয়েছে। দলের অন্য সকলে উঠে পড়ল। যে যার বাড়ি যাবে। ওরা চলে যেতেই মা ডাকলেন—কই তোমরা কোথায়? বিছানা হয়ে গেছে এসে শুয়ে পড়।

আম্মাজান বলল—রাণীমা আমাদের জন্য আপনি এত ব্যস্ত হলেন কেন? দালানের এক ধারেই আমরা পড়ে থাকতাম। সব ছোঁয়াছুয়ি হয়ে যাবে।

মা বললেন—আজ আর আমার বাছ বিচার নেই, বোন। যে

কাজ তোমরা শুরু করেছো, তাতে সব বাছ বিচার আমার ভেঙ্গে গেছে। এসো তোমরা।

মা দাঁড়ালেন না। তাঁর রাতের সন্ধ্যা আহ্নিক তখনো বাকি। শোভান বলল—এ চিঠি কি মতিস্যারের ?

—হ্যাঁ। উত্তর দিল অমল।

চিঠিটা খুলে পড়ল শোভান।

প্রথমেই সব কথা খুলে জানাল ওরা দেবেশকে। বলল—প্রতিজ্ঞা কর এসব কথা কাউকেই বলবি না। আর যখনই মতিস্যারের ডাক আসবে, যুদ্ধে যাবি।

দেবেশও তাই চায়। এক কথায় রাজি হয়ে গেল। তারপর এক এক করে অনেকেই দলে এল। মদন, রাখাল, পাঁচু। মতলেব নিবারণ ইয়াসিন আরও অনেকে। সমস্ত স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছেলেরাই রাজি। সবাই মাটি ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করল দেশের জন্য যুদ্ধ করবে। বুকের রক্ত দেবে।

লঙ্গরখানা কিন্তু ওরা বন্ধ করল না। সে কাজও চলল সমান উৎসাহে। সে ব্যাপারে আম্মাজান আর মা-ই সব। ওরা শুধু খাটে। হারু নন্দীর কাছে চাল চাইতে গেল ওরা। শোভানের এক দূর সম্পর্কের চাচা, তাঁরও অনেক ধান। তাঁর কাছেও গেল।

হারু নন্দী স্পষ্ট বলে দিলেন—খয়রাত করার মতন এক দানাও চাল তাঁর নেই। ভূতভোজনের দায় ওঁর নয়।

শোভানের চাচা হাসান সাহেব বললেন—ফের যদি তোমরা আমার কাছে আসো তো আমি পুলিশে এত্তালা দেব। তোমাদের সব-কটাকে কোমরে দড়ি দিয়ে জেলে পাঠাব।

যুদ্ধের আগে ওরা জেলে যেতে রাজি নয়। তাই ফিরে এল সবাই। কিন্তু চৌধুরীদের গোলাও তো প্রায় শূন্য। এদিকে তামাম তল্লাটে রটে গেছে চৌধুরীদের লঙ্গরের কথা। সে আর বন্ধ করা চলবে না। দলে দলে লোক ছুটে আসে ভাতের আশায়। মা বললেন—তাহলে উপায় ?

উপায় যে কি তা কারও মাথায় এল না।

আরও বড় জোর দুদিন, তারপরে চালের যোগাড় না হলে লঙ্গর বন্ধ হবে। কোনো উপায় নেই।

শোভান বলল—মতিস্যার থাকলে একটা উপায় হত।

অমল বলল—তাঁকে কোথায় পাব। তিনি তো যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছেন। লঙ্গরখানার কথা কি তিনি এখন ভাবতে পারবেন ?

নানান দুশ্চিন্তা নিয়ে রাত্তিরবেলা সকলে শুতে চলে গেল। অনেক রাতে কে যেন ঘরের জানলা খট খটাল। ঘুম ভেঙে গেল আম্মাজানের। চোর নয় তো ? না, তাহলে জানলায় টোকা দেবে কেন ? কিন্তু এত রাতে কেন ? নিশ্চয়ই দিনের আলোয় আসতে চায় না ! শোভানকে ধাক্কা দিয়ে তুলে দিল আম্মাজান—এই উঠে দেখ। আমার মনে হয় ছোটমাষ্টার হবে।

ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসল শোভান।

খুট খুট খুট। আবার জানলায় শব্দ হল।

শোভান চুপি চুপি জানলার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—কে ?

—পাজি উল্লুক ছুঁচো। আধঘন্টা ধরে আস্তাকুড়ে দাঁড়িয়ে আছি, ঘুম ভাঙ্গে না তোর !

—স্যার আপনি ! অবাক শোভান চেঁচাতে যাচ্ছিল।

—চুপ চুপ হতভাগা। দরজা খোল আগে।

ঘরে ঢুকেই উনি বললেন—ডাক, ছোটমাকে ডাক। অমলকে ডাক। তুমি তো আছই, আম্মাজান। আজ আমি তোমাদের এখুনি একটা কথা শোনাতে চাই। এখুনি। দেরী করার আর সময় নেই। চোখ কচলাতে কচলাতে অমল এল। তার পিছনেই এক মাথা ঘোমটা টেনে এলেন মা। এসে দাঁড়ালেন দরজার পাশে।

ভীষণ কিছু যে একটা ঘটতে চলেছে, তাতে আর কারও সন্দেহ নেই। কিন্তু তা যে কি তা কেউই বুঝতে পারছে না।

মতিস্যার বললেন—ছোট মা, আম্মাজান, আমি এসেছি ভিক্ষে

চাইতে—এ ছেলে দুটোকে আমরা চাই। আমি নয়, সারা দেশ আজ ওদের চাইছে। ওদের ছেড়ে দিতে হবে।

মা একথার কোনো জবাব দিলেন না আম্মাজানও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মতিস্যার বলে চললেন—সারা দেশে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে আগুন জ্বলে উঠেছে। ওদিকে সুভাষ বোস তাঁর সৈন্য বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করছেন। দেশ স্বাধীন হতে আর দেরি নেই, মা। এখন আর ভাল ছেলে হয়ে ঘরে বসে থাকলে চলবে না। দেখছেন তো কি অবস্থা। এ আগুনে আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তেই হবে। যুদ্ধ করতেই হবে। এ দেশকে—এ দেশের লোকদের বাঁচাতে হবে। আমার সব প্ল্যান তৈরি, মা। আমার এখন বাছা বাছা ছেলে চাই। যারা এগিয়ে যাবে। যারা ভয় পাবে না মরতে। মতিস্যার থামলেন।

স্পষ্ট গলায় মা বললেন—কিন্তু যুদ্ধ মানে তো সর্বনাশ। তা দিয়ে কি কোনো কিছু ভাল হয়? কত প্রাণ নষ্ট হয়ে যাবে।

—হয়তো তাই, বললেন মতিস্যার।—কিন্তু ভেবে কি দেখছেন মা, বিদেশী শাসকরা কি এদেশ থেকে অমনি চলে যাবে? তারা তো দেশের লোকের ভাল চায় না। সারা দেশে আজ দুর্ভিক্ষ। হাজার লোক না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে। যুদ্ধ না করেও তো আমাদের এত সর্বনাশ হচ্ছে। তবে কেন আমরা যুদ্ধ করব না! তবে কেন আমরা একবার প্রাণপণ চেষ্টা করব না। শেষ সর্বনাশের মধ্যে দিয়ে হয়তো আমরা মুক্তি পাব। আর সে মুক্তি আনবে আমাদের মঙ্গল। না মা না, এ ছাড়া আর আমাদের অন্য কোন পথ নেই। আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিলে, আমি চলে যাব কিন্তু তাতেও এ আগুন নিভবে না। নিভতে আমি দেব না। দোরে দোরে আমি তাজা প্রাণ ভিক্ষে করে বেড়াব। যে পর্যন্ত না এদেশ স্বাধীন হয়। আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না মা।

আম্মাজান বলল—ছোটমাষ্টর। তোমার কথা আমি কোনো দিনই বুঝতে পারিনি। তবে ও ছেলে আমার নয়, তোমার। ওকে

দিয়ে যদি এ পোড়া দেশের কোন ভাল কাজ হয় তো ওকে তুমি নিয়ে যাও। আমি বাধা দেব না। তুমি গরীবের মা বাবা। তোমাকে দিয়ে কোন খারাপ কাজ হবে না আমি জানি। তবে কেন বাধা দেব আমি ?

ছুটে গিয়ে শোভান তার আম্মাজানকে জড়িয়ে ধরল। ও কেঁদে ফেলেছে। কোনমতে বলল—দেখিস আম্মাজান একদিন তুই গাঁ শুদ্ধ সবার সামনে দাঁড়িয়ে গর্ব করে বলতে পারবি শোভান তোর বেটা !



অমল বলল—মা আমিও যাব। তুমি বাধা দিও না।

কাঁপা গলায় মা বললেন—বাধা দিলে তুমি শুনবে? তেমন ছেলে তুমি? কিন্তু এখানে যে কাণ্ড বাঁধিয়ে বসে আছ তা সামলাবে কে? লঙ্গরখানা কি বন্ধ হয়ে যাবে?

মতিস্যার বললেন—না মা। তা কেন হবে? ছেলেদের তো পেলাম, এখন আপনারাও আসুন এগিয়ে। আমার প্ল্যানে আপনাদেরও অনেক কাজ করার আছে। বলে পকেট থেকে একটা কাগজ টেনে বার করলেন উনি—শোভান একটা লণ্ঠন জ্বালতো। আমরা কি করব তা মোটামুটি তোদের বুঝিয়ে দিয়ে যাই।

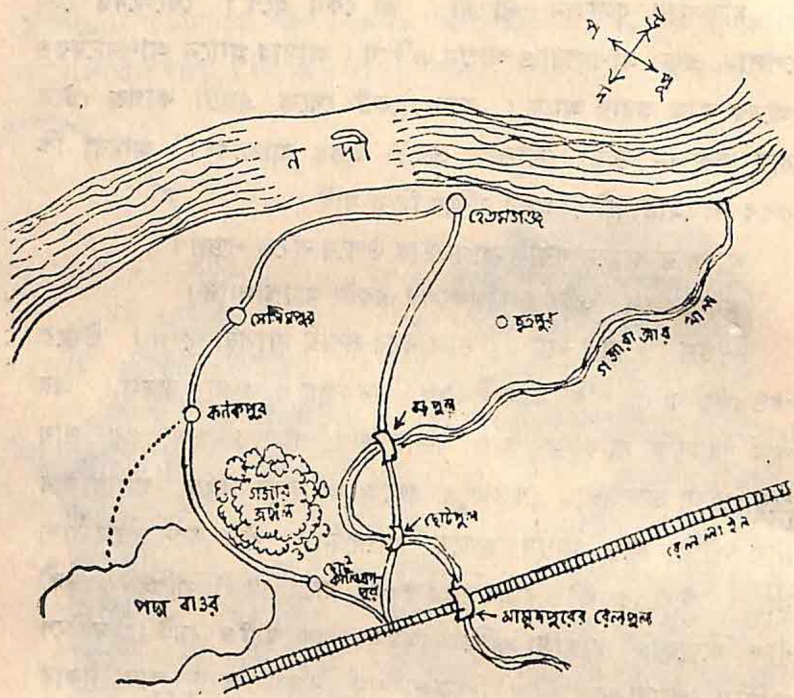
আলোর সামনে সবাই কাগজটার উপরে ঝুঁকে পড়ল।

অমল বলল—এটা তো অঞ্চলের একটা ম্যাপ স্যার।

—হ্যাঁ। তাই বটে। ভাল করে সবাই ম্যাপটা দেখ। উত্তরে হেতমপুরগঞ্জ। পশ্চিমে সেলিমপুর, কনকপুর। গজার জঙ্গল। এর পূর্বে সরকারি নতুন সড়ক। গজারাজার খালকে দুজায়গায় পার হয়ে সোজা চলে গেছে হেতমপুর থেকে মামুদপুর পর্যন্ত; গজারাজার খাল পার হয়ে মানুষ চলতে পারে না। পাঁক আর দামে ঠাসা খাল। উত্তরের নদীও হঠাৎ পার হওয়া যাবে না। পশ্চিমেও নদী বাঁক নিয়েছে। তাছাড়া ওদিকে কোনো পথ ঘাটও নেই। দক্ষিণে পশ্চিমে পদ্মবাওর। সে দিকেও পথ বন্ধ। তার পূবে গজার জঙ্গল। সে জঙ্গলে দিনেও লোক চলে না। এখন আমরা যদি পদ্ম-বাওয়ের উত্তর পশ্চিমে আমাদের প্রথম ঘাঁটি গাড়ি, ক-ঘাঁটি! আর মামুদপুর কনকপুর কাঁচা সড়কের ধারে পদ্মবাওর আর গজার জঙ্গলের মাঝখানে দ্বিতীয় ঘাঁটি গাড়ি, খ-ঘাঁটি। পাকা সড়কের ছোট পুল আর বড় পুল উড়িয়ে দিয়ে তৃতীয়, গ-ঘাঁটি আর হেতমপুরগঞ্জে চার নম্বরের ঘাঁটি গাড়ি, ঘ-ঘাঁটি, তাহলে তো সমস্ত চাকলাইটাকে আমরা স্বাধীন করতে পারব। এ অঞ্চল থেকে ব্রিটিশ শাসন হটিয়ে দেব আমরা। এ হবে আমাদের দেশ, এ দেশ শাসন করব আমরা।

মা বললেন—তারপর ?

—দেশের সমস্ত ধান চাল আমাদের সরকার নিয়ে নেবে। না খেতে পেয়ে কেউ মরবে না, আর লেখাপড়া চলবে বিনা পয়সায়। চিকিৎসার ব্যবস্থাও করবে সরকার। খেতের কাজ সবাইকেই করতে



হবে। চাষ করবে যে, জমির অধিকার তার। কিন্তু মা, সে তো পরে। আগে আমাদের যুদ্ধে জিততে হবে তবে।

—আর যদি যুদ্ধে হার হয়, তবে ?

—তবে পৃথিবীর সবাই জানবে আমরা না খেয়ে মরিনি। মরেছি দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে।

—তাই করুন ভগবান। তাই করুন। মা আস্তে আস্তে বললেন।

—তোমার জন্য আল্লার কাছে আমি দোয়া মাঙ্গব ছোটম্যাষ্টর। —বলল আম্মাজান।

—আমরা কি আপনার সঙ্গে এখনি যাব ? জিজ্ঞাসা করল অমল।

—না না! পাগল হয়েছিস। ব্যস্ত হয়ে বললেন মতিস্যার! দু এক দিন যা করছিস তাই কর। তার মধ্যেই আমি খবর পাঠাব। প্রফেসার পাকড়াশীর কারখানায় পুরোদমে কাজ চলেছে রাত্রি দিন। বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ হয় ? আচ্ছা আমি চলি। তোরাও শুয়ে পড়।

মা বললেন— কিছু খেয়ে যান আপনি।

—দেশ আগে স্বাধীন হোক মা। তখন একদিন আপনার লঙ্গর-খানার মহাপ্রসাদ খেয়ে যাব।

আম্মাজান বলল—হ্যাঁগো ম্যাষ্টর, তুমি যাও এখন। ভোর হয়ে গেলে কে কোথায় দেখে ফেলবে তোমাকে। তখন সব ভেস্তে যাবে। কত গরীবের যে সর্বনাশ হবে তবে। তুমি এখন যাও।

আলো নিভিয়ে দিল শোভান। নিঃশব্দে মতিস্যার ঘর থেকে বার হয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন।

দিন দুই আরও কেটে গেল। লঙ্গরখানার কাজেই সবাই ব্যস্ত। সময় যে কোথা দিয়ে কেটে গেল কেউ বুঝল না। হারু নন্দীর হঠাৎ দয়া হওয়াতে কিছু চালও জুটে গেল ওদের। তাতে আর বড় জোর তিন চার দিন কাজ চলবে, তারপর যে কি হবে তা ওরা ভেবে পেল না। কবে দেশ স্বাধীন হবে। কবে ডাক আসবে যুদ্ধের! কবে স্বাধীন সরকারের হাতে সব ধান চাল চলে যাবে! মনে মনে ওরা সবাই ছটফট করতে লাগল।

একদিন সন্ধ্যার পর ওরা সবাই চৌধুরীদের দালানে বসে রোজকার মতো বিশ্রাম করছে এমন সময়ে একটা বুড়ো লোক এসে দাঁড়াল ওদের সামনে।

—কে ওখানে ? জিজ্ঞাসা করল সুলেমান।

—শোভান আলি আছে ? শোভান আলি। তার চিঠি আছে আমার কাছে। জরুরী চিঠি।

বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে নিচে নেমে শোভান চিঠিটা নিয়ে পড়ল। লেখা আছে— চলে এসো এখুনি। তোমরা দুজনে।

বুড়ো লোকটা বলল—আমি ভিন গাঁয়ের লোক, আমি চলি। তবে আমি আসছি কিন্তু ছত্রপুর থেকে। মনে রেখ বাবা কথাটা। এখন আমার কাজ শেষ। চলি।

লোকটা চলে যেতেই ওরা দুজনে গিয়ে দাঁড়াল মার সামনে। ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যে দেবার ব্যবস্থা করছিলেন মা। ওদের দেখেই উঠে দাঁড়ালেন—তোরা এখুনি যাবি ?

—হ্যাঁ, চাচী। ডাক এসেছে।

—যাও, আমি বাধা দেব না। ওরা চলে আসছিল। মা ডাকলেন—শোভান।

ফিরে দাঁড়াল শোভান—বল চাচী ?

—অমলটা বড় ছেলে মানুষ রে। ওকে একটু দেখিস বাবা।

—তুমি ভেব না চাচী। বলল শোভান।

—নিজের খেয়ালও রাখিস বাবা।

—রাখব, চাচী।

—সঙ্গে কিছু নিবি না ?

—না চাচী। বলে দুপা এগিয়ে এল শোভান।

—তোমাকে ছোঁবো চাচী ?

—কেন রে ?

—তোমাকে একবার প্রণাম করব।

দুজনকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন মা। দুচোখ বেয়ে তাঁর তখন জল পড়ছে।

আম্মাজানের সামনে দাঁড়াতেই আম্মাজান বলল—আর দেরি কর না তোমরা। এখুনি বার হয়ে পড়। রাত থাকতে থাকতে না পৌঁছালে, সব জানাজানি হয়ে যাবে। সে ভাল কথা নয়।

আর কোন দিকে না তাকিয়েই ওরা সোজা রওনা দিল ছত্রপুরের দিকে।

॥ সাত ॥

গ্রাম ছাড়িয়ে ওরা অনেকটা চলে এসেছে যখন কে যেন পিছন থেকে ডাকল—দাঁড়া দাঁড়া। আমি আসছি।

চেনা গলা। অবাক হয়ে ওরা ফিরে দাঁড়াল। হাঁপাতে হাঁপাতে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল দেবেশ—উঃ আমি ছুটতে ছুটতে আসছি। আমাকে ফেলে পালাচ্ছিলি যে বড় ?

—তোকে খবর দিল কে ?

—কেন, সুলেমান চাচা।

—মতিস্যার তো আমাদের দুজনকেই যেতে বলেছেন।

—আমি কি ইংরেজ যে আমি গেলে সব ভেস্তে যাবে ?

—না, তুই ফিরে যা।

—কক্ষনো না। আমিও যাব।

—মতিস্যার রাগ করবেন।

—সে আমি বুঝব।

দেবেশও চলল ওদের সঙ্গে। ওরা প্রায় সারা পথ ছুটতে ছুটতে ভোর তিনটে নাগাদ গিয়ে পৌঁছাল ছত্রপুরে। সারা গাঁ তখন ঘুমে অচেতন। একটু ঘুরে থানা পার হয়ে, ওরা এসে দাঁড়াল প্রফেসর পাকড়াশীর বাড়ির সামনে। সে বাড়িও তখন অন্ধকার। ভেতরে জনমানুষের সাড়াও নেই। কেউ যে আশপাশে কোথাও আছে, তেমনও মনে হল না।

—এখন উপায়! ফিস ফিস করে শোভান জিজ্ঞাসা করল।

—লোকটা কিন্তু ছত্রপুর থেকে এসেছে এ কথাই বলেছিল। বলল অমল।

—কিন্তু এখানে তো কেউই নেই। বলল দেবেশ।

ওর কথা শেষ হতেই খুট করে পাকড়াশী বাড়ির দরজাটা খুলে

গেল। কেউ কাউকে কিছু বলার আগেই ওরা নিঃশব্দে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। অন্ধকারে কিছু বোঝার আগেই কে যেন বলল—এসো আমার পিছন পিছন। পায়ের একটুও শব্দ হয় না যেন। একটা ছায়া মূর্তির পিছন পিছন ওরা আস্তে আস্তে এগলো। বাড়ির পিছনের ধ্বসে যাওয়া দেওয়াল টপকে গাঁয়ের মধ্যের ঘিঞ্জি বাড়িগুলোর ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে ওরা এগলো। একটু এগিয়েই বাঁ দিকে ফিরল ওরা। আরও একটু এগিয়ে সামনের মেঠো দেয়ালের মাঝখানের একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই, আপনি যেন দরজাটা খুলে গেল! দরজা পার হয়ে ভিতরে ঢুকেই ওরা অবাক! একটা খামারবাড়ির বিরাট উঠানে লোকজনের ভিড়। অত লোক, কারো মুখেই কথা নেই। বাড়ির দাওয়ায় বসে আছেন মতিস্যার আর বৃদ্ধ পাকড়াশী মশাই।

—এসেছ তোমরা? এসো, ভিতরে এসে বস। তোমাদের দেরি দেখেই এতক্ষণ আমরা কোনো কথা ঠিক করতে পারছিলাম না। সঙ্গে কে এসেছে? জিজ্ঞাসা করলেন মতিস্যার—

—দেবেশ স্যার। উত্তর দিল শোভান।

—ও কি সব কথা জানে? ফের জিজ্ঞাসা করলেন মতিস্যার।

দেবেশ বলল—না স্যার, আমি সব কথা জানি না। যতটুকু জানি তা থেকেই ঠিক করেছি আমিও আপনাদের দলে।

—বেশ তাহলে কাজ আরম্ভ করা যাক।

সেই ম্যাপটা হ্যারিকেনের সামনে বিছানো হল।

প্রফেসর পাকড়াশী এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন সবার সামনে। বললেন—আমাদের কাজ খুব সহজ নয়। না হোক, যা আমরা করব বলে ঠিক করেছি তা করতে হবে এক সঙ্গে। নইলে ফল খারাপ হবে। প্রথমেই আমরা কাজ ভাগ করে নেবো। আমরা ঘাঁটি গাড়বো চার জায়গায়। প্রথম ঘাঁটি পদ্মবাওরের উত্তর-পশ্চিমে, সেটা আমাদের (ক) ঘাঁটি। আমরা সেখানে আমাদের তীর-ধনুকের

দল রাখব। সে দলের নেতা জগৎ কয়াল। সে তার দল নিয়ে সেখানে থাকবে। তার কাজ, আমাদের হুকুম ছাড়া অচেনা কাউকেই সে পথ দিয়ে ঢুকতে দেবে না ভিতরে। পুলিশ বা সৈন্যদলকে তো নয়ই। আমরা জানি সেদিকে পথঘাট নেই। তাই মনে করি আক্রমণ সেদিক থেকে আসবে না। গজার জঙ্গল আর পদ্মবাওরের মাঝখান দিয়ে গেছে সাবেক কাঁচা রাস্তা। সে রাস্তার উপরে গজার জঙ্গল ঘেঁষে আমাদের দ্বিতীয় ঘাঁটি, (খ) ঘাঁটি বসবে। সে ঘাঁটির নেতা শোভান আলি সে তার স্কুলের দল নিয়ে সেখানে বসবে। অস্ত্র হিসাবে সে পাবে দুটো বন্দুক, হাতবোমা আর তীর-ধনুক। আমার তৈরী বোতল বোমাও সে পাবে। বন্দুক চালাতে তাদের দলের কেউ জানে না, তাই তার সঙ্গে থাকবে রামজান আর কালী সর্দার। তবে সব দায়িত্ব থাকবে শোভানের। সে গাছ কেটে রাস্তার উপরে ফেলে রাস্তা বন্ধ করবে। গর্ত খুঁড়ে পথ নষ্ট করবে। দরকার হলে যুদ্ধ করবে। তার দায়িত্ব অনেক।

পাকা সড়কের ছোটপোল আর বড়পোল দুটোই আমরা উড়িয়ে দেব ঠিক সময়ে। সে পথ তাহলে বন্ধ হয়ে যাবে। সে পথ দিয়ে আর কেউ আসতে পারবে না। এই পোল দুটোর পাশেই বসবে আমাদের তিন নম্বর ঘাঁটি, (গ) ঘাঁটি। সে ঘাঁটির দায়িত্ব আমার নিজের। আমি সঙ্গে নেব বারুদ, বন্দুক দুটো, আর তীর-ধনুক।

—হেতমপুরগঞ্জের কথা বলি। সেখানে থানা আছে। সে থানা আমাদের দখল নিতে হবে। থানার বন্দুক গুলি-বারুদ আমাদের চাই, সেখানেই বসাতে হবে আমাদের (ঘ) ঘাঁটি। এ ঘাঁটির দায়িত্ব মতিমাষ্টারের। আচমকা আক্রমণ করে তাকে থানা দখল নিতে হবে। সে পাবে হাত বোমা। বোতল বোমা। তীর-ধনুক। এতেই তাকে কাজ হাঁসিল করতে হবে।

—বাকী রইল ছত্রপুর। সেখানেও থানা আছে। সে থানাও আমরা দখল করব। সে ভার রইল···কথা তিনি শেষ করতে পারলেন না।

দেবেশ উঠে দাঁড়িয়ে বলল—স্যার এ কাজের ভার আমাকে দিন। ছত্রপুরে আমার মামাবাড়ি। ও গাঁ আমি ভাল চিনি। এ কাজ আমি পারব।

প্রফেসর পাকড়াশী তাঁর চোখের পুরু চশমাটা হাত দিয়ে ঠিক করে নিয়ে তাকালেন দেবেশের দিকে—তুমি পারবে এ কাজ করতে ?

—হ্যাঁ স্যার, পারব। নিশ্চয়ই পারব। ছত্রপুরের সব আমি চিনি।

—বেশ, কি নাম তোমার ?

—দেবেশ ভট্টাচার্য স্যার।

—বেশ তুমিই হলে এ কাজের নেতা। সংকেত পাওয়া মাত্রই জোর করে থানা দখল করবে। বন্দুক গুলি-বারুদ এগুলো চাই। মনে রেখো।

—মনে রাখব স্যার। বলল দেবেশ।

—বেশ তা'লে এবার শোন, কখন আমাদের কি করতে হবে। আমরা খবর পেয়েছি আগামী কাল রাতের অন্ধকারে আট লরী বোঝাই চাল হেতমপুরগঞ্জ থেকে মামুদপুর চালান যাবে। লরী বড়পোল পার হলেই—বড়পোল ছোটপোল দুটোই এক সঙ্গে উড়িয়ে দিয়ে সে চাল আমরা আটকাবো। যদি লরীতে মিলিটারী গার্ড থাকে, আমরা তাদের বন্দী করব। তার আগেই আমাদের (ক) (খ) (গ) (ঘ) ঘাঁটির সব নেতারাই তাদের দল নিয়ে তাদের জায়গায় হাজির থাকবে। থানা দখলকারীরা, থানার আসপাশে থাকবে। দুটো পোল উড়িয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমি আকাশে রঙ্গিন হাউই ছাড়ব, পর পর অনেকগুলো, চার পাঁচটা। সেই হল সংকেত। দুটো থানা সেই মুহূর্তেই দখল করতে হবে। ঘাঁটিদাররা সব ঘাঁটি আগলাতে বসে যাবে। সেই মুহূর্ত থেকেই তাদের কাজ স্নুরু। রসিক ভাল সাইকেল চালায়, সে থাকবে আমার সঙ্গে। পোল উড়িয়ে দিয়েই তাকে পাঠাব আমি অন্য ঘাঁটির খবর আনতে। সব যদি ঠিক মতো হয় তো পরদিন আমরা জাতীয় পতাকা তুলে দেশকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করব। আর তৈরী হব আমাদের স্বাধীনতাকে প্রাণ দিয়ে

রক্ষা করবার জন্য। মনে রেখো এ পর্যন্ত সব কাজের দায়িত্ব আমার। আমার হুকুমই শেষ হুকুম, তা সবাইকেই মানতে হবে। যে বিশ্বাস-ঘাতকতা করবে, আমার কাছে, তার কোন ক্ষমা নেই। স্বাধীনতা পাওয়ার পর যুদ্ধ বা ঘাঁটি আগলানোর দায়িত্ব ছাড়া অন্য সব কাজের ভার তখন মতিমাষ্টারের। তোমরা সবাই বুঝেছ আমার কথা? থামলেন প্রফেসর পাকড়াশী।

অন্ধকারেই সবাই এক সঙ্গে মাথা নাড়ল।

—কারও কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে?

ভোর রাত অবধি হাজার সলা পরামর্শ হল। একে অন্যকে চিনল। সমস্ত কাজটাকে খুঁটিয়ে তন্ন তন্ন করে বিচার করা হল। কে কোথায় কখন কার সঙ্গে মিলবে তা ঠিক করা হল। তারপর জনা কুড়ি বাছা বাছা লোককে থাকতে বলে পাকড়াশী মশাই হাতের ইশারা করে অন্য সবাইকে নিঃশব্দে সে জায়গা ছেড়ে চলে যেতে বললেন।

মতিস্যার এতক্ষণ একটাও কথা বলেন নি। এখন বললেন —স্যার আপনার অস্ত্রসস্ত্র এবারে এদের ভাগ করে দিন। অনেককে অনেক দূরে যেতে হবে। ওরা যাক তাড়াতাড়ি।

সেই প্রথম অমল হাতবোমা দেখল। পাটের দড়িতে জড়ানো যেন কতগুলো খেলনার বল। দেখল পাকড়াশী মশাইয়ের বোতল-বোমা। সাধারণ কাচের বোতলে পেট্রল আর অন্য কি সব যেন ভরা-এ বোমা আগুন জ্বালিয়ে ছুঁড়তে হবে। তীরের মাথায় ধারালো লোহার ফলা লাগানো। ধনুকগুলো সব বাঁশের তৈরী। বাছা বাছা কয়েকজনের হাতে জিনিসগুলো সব ভাগ করে দেওয়া হল।

প্রফেসর পাকড়াশী বললেন—এই সব অস্ত্র নয়। আমার কারখানায় রাতদিন কাজ চলছে। এই দিয়ে এখন কাজ আরম্ভ কর। পরে আরও পাবে।

জগৎ কয়াল বলল—তীর আমার আরো চাই। আর তা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল।

—পাবে। বললেন পাকড়াশী মশাই।—কাল রাতের আগেই আরও অনেক অস্ত্র পাবে তোমরা।

শোভান বলল—আমার ভাগের বন্দুক ছুটো কবে পাব স্যার ?

—সেও পাবে কাল বিকাল নাগাদ। রামজান আর কালী সর্দার কাল বিকালেই গিয়ে যোগ দেবে তোমাদের সঙ্গে।

সে রাতের মতো কাজ মিটল। পাকড়াশী মশাই আবার সবাইকে কখন কি করতে হবে বলে দিলেন। তারপর সবাই যে যার ঘাঁটির দিকে ফিরে চলল। ভারি বোঝা বয়ে নিয়ে বেশ বেলায় অমল আর শোভান ফিরল গাঁয়ে। ক্লান্তিতে তখন ওদের শরীর ভেঙ্গে পড়ছে। বোঝাটা পাঠশালার এক কোণে নামিয়ে রেখে কারও সঙ্গে কোনো কথা না বলেই ওরা সোজা গিয়ে শুয়ে পড়ল।

গজার জঙ্গল আর পদ্মবাওর যেখানটায় রাস্তাটাকে ছদিক থেকে ছুঁই ছুঁই করেছে, ঠিক সেখানেই জঙ্গলা ঝোপের আড়ালে ঘাঁটি গাড়লো শোভান। তার ঠিক কিছু আগেই কাঁচা রাস্তার ছপাশের বড় বড় গোটাকয় গাছকে ওরা কেটে নাবিয়ে দিল পথের উপরে। তার ঠিক পরেই রাস্তাটাকে এপাশ থেকে ওপাশ অবধি ছু জায়গায় কেটে দিল। এর পরেই ছপাশের ছুটো ঝোপের মধ্যে বন্দুক নিয়ে বসল রামজান আর কালী সর্দার। সঙ্গে রইল ছজন করে ছেলে। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে কিছু করে হাতবোমা আর বোতল-বোমা। বোতলবোমা ছোঁড়ার আগুন মাটিতে গর্ত করে জ্বালিয়ে রাখা হল। যেন অন্ধকারে সে আগুনের নিশানা না পাওয়া যায়। এদের পরেই তীর-ধনুক নিয়ে একদল বসল গজার জঙ্গলের ধারের ঝোপগুলোতে। বাকি দলটা বাড়তি অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে লুকলো জঙ্গলে। তাদের উপরে হুকুম হল ঘুমিয়ে নেবার। চারঘণ্টা অন্তর পালা বদল হবে। সব কাজ মিটতে বাজল রাত প্রায় নটা, সবাই তখন উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে পূবের আকাশের দিকে। সংকেতের আলো দেখা যায় কিনা। কড়া হুকুম শোভানের কেউ কথা বলতে

পারবে না, নড়াচড়াও প্রায় বন্ধ। পালা বদলের সময় লুকিয়ে চলা-ফেরা করতে হবে। সবাই খুসি মনেই সে হুকুম মেনে নিল। জনা তিরিশেক ছেলে সেই অন্ধকারে বসে স্বপ্ন দেখতে লাগল, কখন দেশ স্বাধীন হবে।

বৃদ্ধ পাকড়াশী মশাইয়ের হুকুমে সালতেটাকে লগি মেরে ছেলেরা এনে ফেলল ছোটপোলের প্রায় নিচে। সন্ধ্যে লাগতেই ওদের কাজ সুরু হয়ে গেছে। বড়পোলের কাজ শেষ করে এসেছে ওরা। সে পোলের নিচে নিঃশব্দে বসে আছে পাকড়াশী মশাই-এর ডান হাত, বদন চাকলাদার। লরীর সারির শেষ গাড়িটা পোল পার হলেই ও পোলতেতে আগুন দেবে। বারুদ ফাটার শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ছোট পোলের বারুদের পোলতেতেও আগুন দেওয়া হবে। পাকড়াশী মশাই তাড়াতাড়ি তাঁর কাজ সুরু করে দিলেন। বড় জোর ঘণ্টা খানেক, তার মধ্যেই সব কাজ শেষ করে সবাইকে দুই পোলের মাঝ বরাবর একটা ঝোপের আড়ালে লুকোতে বললেন। নিজে একা বসে রইলেন ছোটপোলের নিচে। কখন বড়পোলের ওদিক থেকে শব্দ আসে, শোনার জন্য।

সময়ের কোন হিসাব নেই। রাত ঘনিয়ে আসছে। আশপাশ দিয়ে শেয়ালের দল চলা-ফেরা সুরু করেছে। কাছে দূরে ঝোপে ঝাড়ে একঘেয়ে সুরে ঝিঁঝিঁ ডাকছে। কোনো দিকে কোথাও কোনো শব্দও নেই। কান পেতে বসে রইলেন প্রফেসর পাকড়াশী। তবে কি খবর ভুল? আজ আর চাল বোঝাই কোন লরী আসবে না? এত পরিশ্রম এত আয়োজন সব মিথ্যে হয়ে যাবে! এতগুলো ছেলের প্রাণপণ চেষ্টা বিফল হয়ে যাবে!

একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন প্রফেসর পাকড়াশী। ঠিক তখনি দূরে কোথায় যেন কেমন একঘেঁয়ে আওয়াজ শোনা গেল। চমকে উঠে উনি সেই শব্দকে আরও ভাল করে শুনতে চেষ্টা করলেন। না, কোনো সন্দেহ নেই, এ আওয়াজ লরীর চাকার আওয়াজ। একটা

নয়, অনেকগুলো লরী আসছে। ঝর ঝর ঝর আওয়াজটা ক্রমেই কাছে আসতে লাগল। আরও কাছে আরও কাছে। কিন্তু কই, বড়-পোলের কাছ থেকে তো কোনো বারুদের শব্দ আসছে না। তবে কি চাকলাদার ধরা পড়েছে? তবে কি ওর ব্যবস্থায় কোন গোলমাল হয়েছে তাই বারুদ ফাটে নি? আওয়াজ আরও কাছে এসে পড়ল। আরও কাছে। কেমন যেন অসহায় হয়ে পড়লেন উনি। কি করা উচিত এখন ওর?

বড়পোলের দিক থেকে শব্দ আসছে না কেন!

হঠাৎই দূর থেকে আওয়াজ এল বুম বুম বুম। খোলা মাঠঘাটের উপর দিয়ে সে আওয়াজ দূর থেকে আরও দূরে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেশলাই জ্বেলে বারুদের পোলতেতে আগুন দিলেন প্রফেসর পাকড়াশী। সরসর করে আওয়াজ তুলে আগুন ছুটে চলল। একলাফে জায়গাটা ছেড়ে রাস্তায় উঠে এলেন প্রফেসর পাকড়াশী। বৃদ্ধ দৌড়াতে তেমন পারেন না। তবুও যত জোরে পারেন, চললেন একটা ঝোপের দিকে। ঝোপের আড়ালে পৌঁছাতেই বাঁকের মুখে লরীর সারি দেখা গেল। আলো জ্বেলে আসছে লরীগুলো। ঝোপের আড়াল দিয়েই উনি ছুটে চললেন দলের অন্য সকলের কাছে। পিছনে তখনি চারদিক কাঁপিয়ে আওয়াজ হল বুম বুম বুম!

একটু থেমে একবার পিছনে তাকিয়ে দেখলেন উনি। ইট পাথর আর মাটি ছিটকে উঠে পোলটা ভেঙ্গে পড়ল গজা রাজার খালের মধ্যে। ছুটতে ছুটতে প্রফেসর পাকড়াশী এসে থামলেন দলের মাঝখানে।
—হাউইগুলো কোথায়?

আগুন দেওয়া হল পরপর চার পাঁচটা হাউইতে। আকাশের অন্ধকারে ছুটে গেল সেগুলো সমানে রঙের তারা কাটতে কাটতে! সে আলো মিলিয়ে যেতে না যেতেই পথের দিক থেকে অস্পষ্ট লোকের গলায় আওয়াজ শোনা গেল। সাঁই সাঁই করে গুলি ছুটে গেল আশপাশ দিয়ে অনেকগুলো।

চাপা গলায় হুকুম দিলেন প্রফেসর পাকড়াশী—শীগগির সবাই শুয়ে পড় মাটিতে। শীগগির। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এ জায়গা ছেড়ে চল ছোটপোলের দিকে ঝোপের আড়াল দিয়ে। এরা হাউইয়ের আলো দেখতে পেয়েছে, এখনি এসে পড়বে এখানে।

সবাই ওঁর হুকুম মতন এগিয়ে চলল ছোটপোলের দিকে।

গুলি কিছুক্ষণ চলে বন্ধ হল! তখুনি প্রফেসর হুকুম দিলেন—মুখ ফেরাও সকলে রাস্তার দিকে। গণেশ, তুই আস্তে এগিয়ে দেখ লোকগুলো ঝোপের দিকে ঢুকছে কিনা। দেখিস ধরা পড়িস না যেন। দেখেই চলে আসবি। আমরা এখানেই থাকব।

গণেশ চলে গেল। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এসে বলল—ছটা মিলিটারী ঢুকেছে জঙ্গলের মধ্যে বন্দুক হাতে নিয়ে।

—ঘিরে ফেল ওদের। যেন কোনো শব্দ না হয়। দুলাল তোর দল নিয়ে যা বাঁ দিকে। রহমন তুই ডান দিকে আর বাকি যারা আয় আমার সঙ্গে। ওদের ঘিরে ফেলে এক সঙ্গে ওদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। মনে থাকে যেন এক সঙ্গে কাজ করতে হবে, আমার সংকেত পাওয়া মাত্র।

সবাই ছড়িয়ে পড়লো জঙ্গলের মধ্যে। প্রফেসর এগোলেন। পিছনে তাঁর দল। ঝোপ যেখানে পাতলা হয়েছে, সেখানে পৌঁছেই উনি দেখতে পেলেন লোকগুলোকে। খুব সন্তর্পণে এগোচ্ছে ওরা ঘন জঙ্গলের দিকে। দলকে ইশারা করে, আরও এগিয়ে গেলেন প্রফেসর। লোকগুলো যখন প্রায় ঘন ঝোপের কিনারায় এসে পৌঁছেছে তখনি মুখে আঙ্গুল পুরে ভীষণ জোরে একটা শিস দিলেন উনি। মুহূর্তে চারিদিক থেকে লোকগুলোর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল সকলে। ওরা বন্দুক ঘোরাবার আগেই বন্দুক ওদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হল।

—গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেল ওদের। দেরি করিস না। পথের দিকে এগোতে হবে আমাদের।

—আমাদের মেরো না। বন্দীদের একজন করুণ ভাবে বলল।

—না, লোক খুন করা আমাদের কাজ নয়। —বললেন প্রফেসর। মনে রেখো তোমরা, চেঁচালেই তোমাদের মারতে বাধ্য হব আমি।

চটপট কাজ শেষ করে ওরা তৈরি হল।

—বন্দুকগুলো বাগিয়ে ধর। বলে একটা বন্দুক নিজের হাতে তুলে নিলেন প্রফেসর—ছুঁড়তে পারিস চাই না পারিস, বন্দুক বাগিয়ে ধরেই এগোতে হবে আমাদের। ছড়িয়ে পড়ে সবাই এগো রাস্তার দিকে। আমার হুকুম না পেলে ঝোপের বাইরে বার হবি না কেউ।

আকাশের গায়ে পর পর চার পাঁচটা হাউইয়ের আলো ফুটে উঠতেই অন্ধকারের মধ্যে সাদা রুমাল বার করে শূন্যে দু-চার বার নাড়লেন মতিমাষ্টার তারপর ধীর পায়ে এগোলেন থানার বড় ফটকের দিকে। ফটকের সামনেই অন্যরাও এসে মিলল ওঁর সঙ্গে। বিনা বাধায় থানার ভিতরে ঢুকে পড়লো ওরা সবাই। গেটের পুলিস এক সঙ্গে এত লোক দেখে ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—কি চাই তোমাদের এত রাতে। সে কথার কেউ কোনো উত্তর দিল না। একদল থানার চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। বাকি দলকে নিয়ে মতিমাষ্টার ঢুকলেন থানার মধ্যে। দারোগা সাহেব তখন উপরের কোয়ার্টারে খেতে গেছেন। ছোট দারোগা টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করছিলেন। অত লোককে এক সঙ্গে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ব্যাপার কি? এত রাতে এমন দল বেঁধে। দাঙ্গা মারপিট নাকি?

—না। বেশ স্পষ্ট গলায় উত্তর দিলেন মতিস্যার। স্বদেশী গভর্নমেন্টের নামে এ থানা আজ এখুনি আমরা দখল নিলাম।

—মানে! চেঁচিয়ে উঠলো ছোট দারোগা—ইয়ার্কির আর জায়গা পাওনি?

বিনা বাধায় হেতমপুরগঞ্জের থানা দখল হয়ে গেল। সমস্ত পুলিস আর থানার অফিসারদের হাজত ঘরে বন্দী করা হল। বন্দুক

গুলি বারুদ যা কিছু ছিল থানায়, তা এসে গেল মতিমাষ্টারের দলের লোকদের হাতে।

হাউইয়ের সংকেত ছত্রপুরের দেবেশও দেখতে পেয়েছিল। দলবল নিয়ে আচমকা ও থানায় ঢুকে পড়েছিল। থানাও দখল করেছিল, কিন্তু কোথায় যেন হিসাবের একটু গোলমাল হওয়াতে দারোগার হাতের পিস্তলের গুলি ছুটে ছিল। তার প্রথম গুলিতেই ঘায়াল হয়েছিল দেবেশ। তবুও থানা দখল করেছিল। থানার সবাকে বন্দী করেছিল।

সব কাজ মিটতে ওর দলের অনেকেই ছুটে এলো ওর কাছে। ও তখন একটা বেঞ্চে শুয়ে হাঁপাচ্ছিল। দলের একজন ছুটে গেল ডাক্তার ডাকতে। রক্তে সমস্ত জায়গাটা লাল হয়ে গেছিল। ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল দেবেশের। তবুও ওর মুখে হাসি। হাঁপাতে হাঁপাতে ও বলল—থানা দখল করেছ তোমরা?

—হ্যাঁ, করেছি।

—মতিস্যারকে বলবে আমি আমার কাজ করেছি।

—বলবো।

—আমার মা আর বাবাকে বলবে। আমি দেশের জন্য প্রাণ দিলাম। তাঁরা যেন আমার জন্য দুঃখ না করেন। তোমরা থানা ছেড়ে যাবে না। কি হুকুম আসে শুনবে। সেই মতন কাজ হওয়া চাই।

—তোমাকে আমরা বাঁচাব। বলল সকলে। তুমিই আমাদের দলপতি।

—আমারও খুব বাঁচতে ইচ্ছে করছে। স্বাধীন দেশের হাওয়ায় বেঁচে থাকার যে কি আনন্দ তা আর আমি বুঝতে পারব না। আমার জন্য কেউ কেঁদো না। বাবা মাকেও কাঁদতে বারণ কোরো।

ডাক্তার এল না। এসব বিপদে তিনি জড়াতে চান না। দলের দু-চার জন একথা শুনে তখুনি ঘর থেকে বার হয়ে গেল—ডাক্তারকে ধরে আনবার জন্য।

ডাক্তারকে নিয়ে ফিরল যখন, তখন সব শেষ হয়ে গেছে।

॥ আট ॥

গজার জঙ্গলে ওরা তখন সবাই খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে। সময় বয়ে চলেছে। কোথায় সংকেতের আলো? তবে কি সব গোলমাল হয়ে গেল? অস্বস্তিতে ওরা ছটফট করতে লাগল। যে দুজন গাছের মাথায় উঠে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল তারাও যেন কেমন ঘাবড়ে গেল। এত দূর থেকে কি তবে ওরা আলো দেখতে পেল না। দূরত্বের কথাটা কিন্তু কারও মনে জাগেনি এর আগে। সবার মনে কেমন যেন একটা অজানা ভয় জেগে উঠল। সবাই ওরা ছেলেমানুষ। স্কুলের ছেলে। স্বাধীন দেশের কথা ভেবেই এগিয়ে এসেছিল। সেই স্বাধীনতা পেতে গেলে যে যুদ্ধের দরকার, তার খারাপ দিকটার কথা ওদের মনেই পড়েনি। এখন এই ঘন অন্ধকারের মধ্যে জঙ্গলের মাঝখানে বসে সব কিছু কেমন যেন ওদের গোলমাল হয়ে গেল। বাড়ির কথা মনে পড়ে মনও যেন কেমন খারাপ হয়ে গেল।

চাপা গলায় অমল বলল—কোথাও কিছু গোলমাল হয়ে যায়নি তো? এত দেরী হচ্ছে কেন?

শোভান চুপ করে পথের দিকে তাকিয়ে ছিল, বলল—মতিস্যার যে কাজে হাত দেন তাতে ভুলচুক থাকে না, আমি জানি। তোর কি ভয় করছে অমল?

—না। বলল অমল—তবে কেমন যেন বিচ্ছিরি লাগছে। একে কি তুই ভয় বলিস?

—কি জানি? অমন সবারই হয়। আমারও খারাপ লাগছে। তবে যুদ্ধ সুরু হলে আর ওসব কথা মনে থাকবে না।

—কিন্তু কোন দিকেই তো কোন সাড়াশব্দ নেই।

—এক্ষুণি কি যুদ্ধ শুরু হবে। ঘাঁটি আগলে দু একদিন বসে

থাক, তবে তো দেখবি যুদ্ধ কাকে বলে। খবর সরকার বাহাদুরের কাছে পৌঁছাক আগে।

তখুনি গাছের উপর থেকে আস্তে শিসের শব্দ শোনা গেল। প্রথমে এ গাছ থেকে পরে অন্য গাছটা থেকে।

—ঐ শুনেছিস। বলল শোভান—যাক্, কাজ শুরু হয়ে গেছে। এতক্ষণে প্রফেসর পাকড়াশী নিশ্চয় দুটো পোলই উড়িয়ে দিয়েছেন। দেশ আমাদের স্বাধীন হল রে অমল!

এ খবর শুনল ওদের দলের সকলে। হাউইয়ের আলো দেখা গেছে চার পাঁচটা! যে ভয় সবার মনকে ছোট করে দিয়েছিল, আচমকা তা কেটে গেল। পালা বদল করে বাড়তি সকলেই শুয়ে পড়ল মাটির উপরে। স্বাধীন দেশের মাটির কি মিষ্টি গন্ধ।

ভোর রাতের দিকে একটু ঝিমুনি এসেছিল শোভানের। হঠাৎ কে যেন ওকে ধাক্কা দিল। ঘুম ছুটে গেল ওর।

—শুনতে পাচ্ছিস? চাপা গলায় অমল জিজ্ঞাসা করল—পথের দিকে কেমন যেন একটা ঝর ঝর শব্দ হচ্ছে না? শব্দটা যেন এদিকেই আসছে!

—হ্যাঁ, তাইতো! পথের ধারের ঘাঁটির পাহারা কি ঘুমিয়ে পড়েছে! শীগ্‌গির অমল তুই দেখে আয় তো ব্যাপার কি? বিপদ বুঝলে বোমা ছুঁড়বি। দেরি করবি না।

জঙ্গলের আড়াল দিয়ে অমল এগলো শব্দটার দিকে। প্রথম ঘাঁটির ছেলেরা জেগেই আছে। শব্দটা যে কি তারাও বুঝতে পারছে না? আরও এগলো অমল। ঠিক রাস্তা ঘেঁসে যে ঘাঁটি সেখানে পৌঁছাতেই সে ঘাঁটির ছেলেটা বলল—এ শব্দ সাইকেলের। কেউ সাইকেল চড়ে আসছে এদিকে।

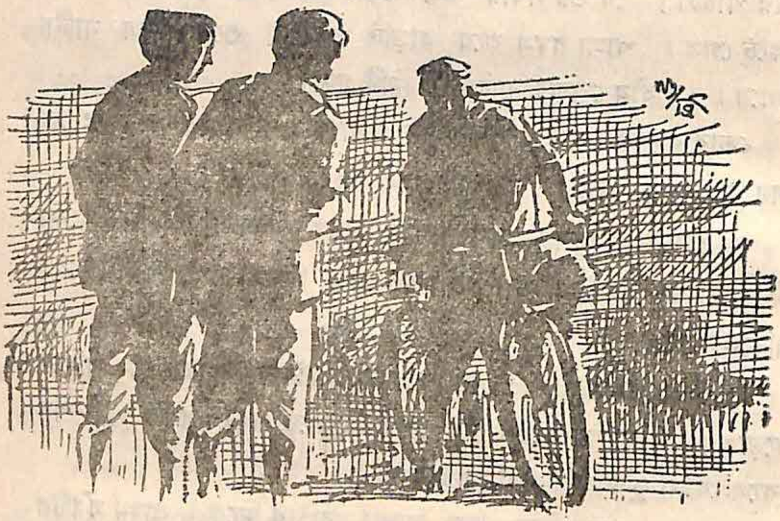
ঝোপের ফাঁক দিয়ে অমল রাস্তার দিকে ভাল করে তাকাতেই দেখতে পেল, ঘন জমাট অন্ধকারে ছায়ামূর্তি যেন একটা তরতর করে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। একটা লোকই যে সাইকেল চড়ে আসছে

তাতে আর সন্দেহ নেই। মুখের উপরে হাত আল্গা ভাবে রেখে অমল পেঁচার ডাক ডাকল—ভূত ভূতুম ভূত।

লোকটা চটকরে সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়িয়ে পড়ল এক জায়গায়।

—ভূত ভূত ভূতুম ভূত। আবার ও ডাকল অমল। সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে এল লোকটা ঝোপের দিকে।

—ভূত ভূত ভূতুম ভূত, আমি রসিক দাস। চাপা গলায় বলল লোকটা। খবর আছে। অনেক খবর।



সবাই শুনল খবর। দেশ স্বাধীন হয়েছে! তবে তার জন্য প্রাণ দিয়েছে দেবেশ! এই যুদ্ধের প্রথম শহীদ দেবেশ।

কান্না পেল সকলের। কিন্তু কেউ কাঁদল না।

রসিক বলল—কাল কনকপুর স্কুল ময়দানে মিটিং আছে। সেই মিটিংএ সবাইকে জানান হবে স্বাধীনতার কথা। মতিমাষ্টারের হুকুম, ঘাঁটি ছেড়ে সবাই যাবে না। যারা বাড়তি শুধু তারাই যাবে।

শোভান বলল—আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কি হবে?

—সকালে বিকালে দুবেলা লোক এসে খাবার দিয়ে যাবে। সে ব্যবস্থা করবেন মতিমাষ্টার। চব্বিশ ঘন্টা ঘাঁটি আগলে বসে থাকার হুকুম হয়েছে। চালের লরী না পৌঁছালেই সব জানাজানি হয়ে যাবে। ওরা তখনি সৈন্য পাঠাবে। তখনি আসল যুদ্ধ।

অমল বলল—দেবেশের বাবা মা কি এ খবর শুনেছে?

—শুনেছেন তাঁরা। আমিই খবর পৌঁছে দিয়েছি।

—তাঁদের যে আর কেউ নেই!

—আমরা তো সবাই আছি। শোভান বলল—আর যুদ্ধ শুরু হলে কত মায়ের যে বুক ভাঙ্গবে তা কে বলতে পারে! তবুও আমাদের দুখ করলে চলবে না। আমাদের যুদ্ধ করতেই হবে। নইলে দেবেশের মরাটা মিথ্যে হয়ে যাবে রে।

রসিক বলল—আমি চলি। আমাকে আবার ক-ঘাঁটিতে যেতে হবে। সেখানকার খবর নিয়ে ফিরতে হবে হেতমপুরগঞ্জে। বসে থাকলে আমার চলবে না।

সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে রসিক আবার গিয়ে উঠল রাস্তায়। সাইকেলে চড়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ও অদৃশ্য হয়ে গেল ঘন অন্ধকারের মধ্যে।

—আমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে রে শোভান দেবেশের কথা ভেবে। আমরাই ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম ছত্রপুরে। কেমন করে ওর মার কাছে মুখ দেখাব? কান্নায় জড়িয়ে এল অমলের গলা।

অমলের পিঠের উপরে একটা হাত রেখে শোভান বলল—তুই ফিরে যা, অমল। এসব কাজ তোকে দিয়ে হবে না। কাল যদি আমি গুলি খেয়ে মরি, তবে তো দেখছি তুই কাঁদতে বসবি। যুদ্ধ করতে পারবি না। যা এখনও সময় আছে, তুই ফিরে যা।

জামার হাতায় চোখ মুছে অমল বলল—বাঃ দুঃখ হলে কাঁদতেও পারব না? আমরা কি মানুষ নই?

—না, তেমন মানুষ আমরা নই। তেমন হলে মতিমাষ্টার আমাদের ডাকতেন না। আর কথায় কথায় যারা কাঁদে তারা ভীরু। একটা ভীরু দলে থাকলেই সবার মনের সাহস চলে যায়। কাঁদবি যদি বাড়ি গিয়ে কাঁদ। এখানে নয়। খুব স্পষ্ট করেই কথাগুলো বলল শোভান।

লজ্জা পেয়ে অমল বলল—বেশ এবারের মত ক্ষমা কর ভাই। দেখিস আর কখনও আমার চোখে জল আসবে না।

এ কথার কোন উত্তর দিল না শোভান। শুধু অমলের পিঠের উপর রাখা হাতটাতে একটু চাপ দিল।

শোভানের হুকুম শুনে আবার যে যার ঘাঁটিতে ফিরে গেল। আবার চারদিক জুড়ে নিস্তব্ধতার মাঝখানে একটানা ঝিঁঝির ডাক শোনা যেতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই কাছে দূরের শেয়ালগুলো একসঙ্গে প্রহর শেষের ডাক শুরু করে দিল। সে ডাকও থামল কিছু পরে। আকাশের তারাগুলো আস্তে আস্তে দিক বলয়ের দিকে ঝুঁকে পড়তে লাগল। পূবের ঝুলে পড়া আকাশের গায়ে সাদাটে আলোর আভাস জাগল। আস্তে আস্তে সে আলো লাল হয়ে উঠল। ঝোপ জঙ্গল আর সীমা ছাড়া পদ্মবাওর লালে লাল করে পৃথিবীর কোল ছেড়ে সূর্য হঠাৎ উঁকি মারল আকাশে। একটা ভীষণ রাত কেটে গিয়ে সকাল হল।

তামাম দুনিয়ায় খবর রটে গেলো। দেশ স্বাধীন হয়েছে। আর দুঃখ-কষ্টের দিন নেই। সব দুঃখের শেষ!

স্কুল ময়দানে দুপুর থেকেই দলে দলে লোক জমা হতে শুরু করে দিল। সবাই খুসি, সবার মুখে হাসি। সবারই মুখে একই কথা। মতিমাষ্টার একটা কাজের মতন কাজ করেছে। এবারে আর কারও খাওয়া পরার অভাব থাকবে না। যারা অনেক বুড়ো

তাঁরা কিন্তু তত খুশি নন। তাঁদের কথা—দেখো এ স্বাধীনতা কতদিন থাকে। ইংরাজ সরকার কি অত সহজে ছেড়ে দেবে? শেষে একটা ভীষণ কিছু না হয়ে যায়। ছেলে ছোকরার দল সে কথা হেসেই উড়িয়ে দিল। কি হবে? যুদ্ধ? মতিমাস্টার তার জন্য তৈরি। দিকে দিকে ঘাঁটি গেড়ে লোক বসে গেছে! সে ঘাঁটি পার হয়ে আর কাউকেই আসতে হবে না। মতিমাস্টার কি এসব কথা না ভেবে দেশ স্বাধীন করেছেন। তাছাড়া ভগবান আমাদের সহায়। আমরা আর হারব না।

ঠিক চারটের সময় মিটিং শুরু হল। মতিমাস্টার বক্তৃতা দিলেন। স্বদেশী ঝাণ্ডা আকাশে তোলা হল। সবাই চেঁচাল—বন্দেমাতরম্। বন্দেমাতরম্।

সেই মিটিংয়ে সবার সামনে দাঁড়িয়ে হারু নন্দী ঘোষণা করলেন তাঁর গোলার অর্ধেক ধান চাল তিনি স্বাধীন সরকারকে দিয়ে দিলেন। হাসান সাহেবও পিছিয়ে রইলেন না। তিনিও দান করলেন। চারদিক থেকে চটাপট হাততালি পড়ল।

সবার শেষে সকলের সামনে এসে দাঁড়ালেন দেবেশের বাবা। তিনি বললেন—বাবা সকল, তোমরা জান আমার একমাত্র ছেলে তোমাদের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছে। সে দুঃখ আমার বুকে বাজবে না যদি এ স্বাধীনতা তোমরা বজায় রাখতে পার। তোমরা আজ এখান থেকেই প্রতিজ্ঞা করে যাও, এ স্বাধীনতা তোমরা দরকার হলে প্রাণ দিয়েও বজায় রাখবে। নইলে এ হবে ছেলেখেলা। বহু প্রাণের বদলে সে খেলায় লাভ নেই।

ওঁর কথা শুনে কেউ হাততালি দিল না। সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল —আমরা মরব, তবুও এ স্বাধীনতা হারাবো না।

মিটিং শেষ হবে যখন, তখন দূর থেকে বহু গলায় চিৎকার উঠল, বন্দেমাতরম্। শহিদ দেবেশ জিন্দাবাদ। সবাই ফিরে তাকিয়ে দেখল। ছত্রপুরের দিক থেকে বিরাট একটা মিছিল আসছে। ছেলে

মেয়ে বুড়ো, বহু লোক তাতে। তারা বয়ে আনছে দেবেশের দেহ। বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্।

ভিড় দু পাশে সরে গিয়ে মাঝখানে পথ করে দিল। মিছিল এসে থামল মিটিং-এর জায়গার সামনে। অমনি হুড়োহুড়ি পড়ে গেল ভিড়ের মাঝখানে, কে আগে এসে শহিদকে দেখবে।

মতিমাস্টার চেঁচিয়ে উঠলেন—এমন করে ঠেলাঠেলি কোরো না তোমরা। লাইন দিয়ে এক এক করে এগিয়ে এসো। আর প্রতিজ্ঞা করে যাও দরকার হলে অমনি হাসিমুখে প্রাণ দেবে।

শান্ত হল সবাই। এক এক করে তারা এগিয়ে আসতে লাগল। কারও চোখে জল, কারও মুখ গম্ভীর। বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্।

অনেক রাতে দেবেশের চিতায় যখন আগুন দেওয়া হল তখনও চারদিকে লোক গিজগিজ করছে।

রাতের খাবার নিয়ে এসেছিল সুলেমান। সঙ্গে আরও অনেকে। বলল—একদিনেই দেশের হাল বদলে গেছে বাপজান। এ যেন যাদু লেগেছে। জান তোমরা দেশের সবাই নাম লেখাতে চায় মতিমাস্টারের দলে। ইস্কুল বাড়িতে আপিস বসে গেছে স্বদেশী সরকারের। মতিমাস্টারের চেলারা সেখানে খাতা খুলে কাজ শুরু করে দিয়েছে। ধান চাল বিলোনো শুরু হয়ে গেছে। লঙ্গরখানার কাজ ডবল। মাঠান আর আম্মাজানের আর এক দণ্ডও ফুরসত নেই। ভট্টাচার্যি মশাইও পুত্রশোকে কাঁদছেন না। গেরস্ত বাড়ি ঘুরে ঘুরে কার কি অভাব তার খোঁজ নিয়ে বেড়াচ্ছেন। সারা কনকপুরের সাহায্য ভাণ্ডারের ভার তাঁকেই দিয়ে গেছেন মতিমাস্টার।

শোভান সব কথা চুপ করে শুনছিল, বলল—চাচা, বেশি রাত কর না এখানে। কাজ মিটিয়ে তাড়াতাড়ি ফের। সন্ধ্যের পর এখানে কথা বলা বন্ধ। অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে থাকা আমাদের কাজ। কথা বললে ধরা পড়ে যাব যে।

লজ্জা পেয়ে সুলেমান বলল—সে তো নিশ্চয়ই। তবে কি জানিস

শোভান, কি যে হচ্ছে আমার মনের ভিতরে, কথা না বলেও থাকতে পারছি না। যাক সে কথা। বলে সুলেমান সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে চুপি চুপি বলল—জানিস শোভান, মতিমাস্টরের সঙ্গে আজ যেই দেখা হয়েছে অমনি উনি বললেন—চাচা, অমন পালিয়ে বেড়ালে চলবে না! কালই তোমাকে একটা কঠিন কাজ দেব। সেটা করে দিতে হবে। কাজটা যে কি আমি জানি না। তবে করব নিশ্চয়ই। এই মুখ্যু মানুষটাকে দিয়ে যদি দেশের কাজ হয় সে তো ভাগ্যের কথা!

সুলেমান তার দলবল নিয়ে চলে গেল।

আবার আর একটা রাত এলো। চারদিক নিস্তব্ধ। কারও মুখে কোনো কথা নেই। চার ঘণ্টা অন্তর পাহারা বদল। এমনি করেই রাত ভোর হয়ে গেল।

পরদিন অনেক বেলায় সুলেমান এসে হাজির! সঙ্গে তার একটা পুটলি। হাসি মুখে সবার মাঝখানে এসেই ও বলল —কাজ পেয়েছি গো বাপজান। তবে তোমাদের মতন যুদ্ধুর কাজ নয়। আমার উপর হুকুম হয়েছে মামুদপুরে গিয়ে থাকবার। সেখানকার হালচাল সব জানাবার। টেরেনে করে সেপাইসান্ত্রিরা এলো কিনা, তার খবর দিতে হবে। আমি চললাম।

পোঁটলা কাঁধে ফেলে ও এগিয়ে গেল ভাঙ্গা রাস্তার দিকে। কিছুদূর গিয়েই ফিরে এসে বলল—আসল কথাই বলতে ভুলে গিয়েছি। দুপুর নাগাদ নতুন দল আসবে। তাদের হাতে ঘাঁটির ভার বুঝিয়ে দিয়ে তোমরা ফিরে যাবে কনকপুরে। দুদিন বিশ্রাম নিয়ে আবার তোমরা আসবে। সব ঘাঁটিতে বদলী দল দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এমনি চলবে এখন। পাকড়াশী মশাইয়ের হুকুম। আর দাঁড়াল না সুলেমান। গাছের গুঁড়িগুলোর পাশ দিয়ে ভাঙ্গা রাস্তা পার হয়ে, ও চলে গেল মামুদপুরের দিকে।

দুপুর নাগাদ এল নতুন দল। সঙ্গে রসিক দাস। তাদের নেতার কাছে সব কাজ বুঝিয়ে দিয়ে, শোভান তার দল নিয়ে রওনা

দিল কনকপুরের দিকে। চলে যেতে কারও মন চাইছিল না। কিন্তু প্রফেসর পাকড়াশীর হুকুম মানতেই হবে। রসিকও ফিরল ওদের সঙ্গে। তাকে আবার অন্য নতুন দলকে পৌঁছে দিতে হবে (ক) ঘাঁটিতে। ও আগেই চলে গেল।

অমল বলল—দেশ তো স্বাধীন হল শোভান, কিন্তু কই যুদ্ধ তো শুরু হল না!

শোভান বলল—এত ব্যস্ত কেন? দাঁড়া, আগে খবর পৌঁছাক ও তরফের কাছে। তখন দেখবি যুদ্ধ কাকে বলে!

কনকপুরে পৌঁছে শোভান তার দলের সবাইকে বলল—কাল সবার ছুটি। পরশু কিন্তু ঠিক দুপুরেই স্কুলের মাঠে সবাই জমা হবে। দেরী করবে না কেউ।

সবাই কথা দিল কেউ দেরি করবে না। তারপর যে যার বাড়ির দিকে চলে গেল। হাঁটতে হাঁটতে চৌধুরী বাড়ির ফটকের কাছে যখন ওরা পৌঁছল, তখনও লঙ্গরখানার কাজ চলেছে। মা আর আম্মাজান ব্যস্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছেন। পাড়ার আরও সব বাড়ির মেয়েরা সেখানে।

ওদের দেখতে পেয়েই কে যেন চেঁচিয়ে উঠল—ঐ দেখ না মা কারা আসছে। হাতের বালতি নামিয়ে রেখে মা আর আম্মাজান দুজনেই ছুটে এলেন।

—বড্ড খিদে পেয়েছে চাচী। শীগগির আমাদেরও খিচুড়ি দাও। হেসে শোভান বলল।

রাত্রিবেলা পাশাপাশি বিছানা করে দুজনে শুল। ওদের একপাশে মা আর অন্য পাশে আম্মাজান। মা জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁরে ওখানে তোদের বড় কষ্ট, না?

শোভান বলল—না চাচী এতটুকুও কষ্ট নেই। দুবেলা পেটভরে খাওয়া, আর চুপচাপ বসে থাকা। এতে আর কষ্ট কি?

মা আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলেন না। আম্মাজান বলল

—তা বাপু তোরা যে কষ্টই করিস না কেন, তোরা পৃথিবীটাকে উল্টে দিয়েছিস্। ওরে বাবা এমন যে হতে পারে তা আমি ভাবতেই পারিনি। আল্লা তোদের সবার ভাল করবেন।

অমল জিজ্ঞাসা করল—মা তুমি ভট্টাচার্য মশাইদের বাড়িতে গিয়েছিলে ?

—গিয়েছিলাম। হ্যাঁরে, তোদের এ যুদ্ধ কবে থামবে রে ?

একথার ওরা কেউ কোনো উত্তর দিতে পারল না। একটু চুপ করে থেকে শোভান বলল—এ যুদ্ধ কি সহজে থামবে, চাচী। সারা মুলুকটা এমনি করে যেদিন স্বাধীন হয়ে যাবে সে দিনই এ যুদ্ধ থামবে। তার আগে নয়। মতিস্যার তাই বলেছেন।

—বুঝি না আমি। কত মার যে বুক শূন্য হয়ে যাবে!

অমল আর থাকতে না পেরে বলল—তাহলেও মা একাজ আমাদেরই করতে হবে। নইলে দেশ স্বাধীন হবে কি করে বল ?

আম্মাজান বলল—তোমাদের ঐ এক কথা। তোমরা মায়ের ব্যথা বুঝবে কি করে ?

শোভান তাড়াতাড়ি বলল—রাত অনেক হয়েছে এবারে সবাই ঘুমাও। কাল তো আবার অনেক কাজ।

চার পাঁচ দিন কোনো দিকে কোনো গোলমাল হল না। পালা-বদল করে সবাই ঘাঁটি আগলাতে লাগল। মাঝে শুধু একদিন খবর এল চালের লরীর সঙ্গে যে সব সেপাইরা এসেছিল তাদের কয়েকজন সকালবেলা জঙ্গলে গিয়ে আর ফিরে আসে নি। পাহারা দিচ্ছিল যারা তাদের বোকামিতেই তারা পালিয়েছে।

সেদিনই বিকেলবেলা সুলেমানের কাছ থেকে খবর এল। সেই সেপাইরা মামুদপুরে পৌঁছেছে। সেখানে থেকে তারা নানান দিকে টেলিগ্রাম করেছে। মামুদপুরের পুলিশ থানায় সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। এ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রফেসার পাকড়াশীর কারখানায় তৈরী, বোমা, বোতলবোমা আরও এসে পৌঁছাল ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে।

সব ঘাঁটিতে লোক বাড়ানো হল। অনেক তীর ধনুক আর নতুন-দখলকরা বন্দুক আর গুলি এসে পৌঁছাল।

অমল আর শোভানের ডাক পড়ল (গ) ঘাঁটিতে প্রফেসর পাকড়াশীর কাছে। কি করে বন্দুক ছুঁড়তে হয় শিখতে হবে। মহা উৎসাহে ওরা বন্দুক ছোঁড়া শিখতে লাগল। মতিমাস্টারের সরকার ততদিনে সব দিকের সব কাজ বুঝে নিয়েছে। স্কুলগুলো আবার চালু হয়েছে। ছোট সব ছেলেরাই সেখানে যাচ্ছে। বছরকার খোরাকী আর বীজধান রেখে সব ধান গরীবদের মধ্যে হিসাব মতন বিলোনো শুরু হয়েছে। যত চোর ডাকাত ফের ধরা হয়েছে। তারা হাসিমুখে লেগে গেছে হেতমপুরগঞ্জের বাঁধ মেরামতের কাজে। ছত্রপুর আর হেতমপুরের দুটো হাসপাতালেই বিনা পয়সায় চিকিৎসা শুরু হয়ে গেছে। যেখানে যত ওষুধপত্র পাওয়া যায়, তা সরকার নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে। নতুন সরকারের হুকুমে বহু লোক ঘাঁটি পার হয়ে নানান দিকে চলে গেছে দরকারি সব জিনিসের খোঁজে। ঘাঁটির হুকুম নিয়ে তবে তারা যাওয়া আসা করছে। দেখতে দেখতে পনেরোটা দিন কেটে গেল। কোনোদিকে কোনো গোলমাল নেই। চাষীরা আবার তাদের ক্ষেতের কাজ শুরু করে দিল। দল বেঁধে গ্রাম ছেড়ে আর কেউ ভিক্ষেয় বার হয় না। গ্রামেই তারা খাবার পায়। সরকার তাদের সবাইকেই কোনো না কোনো কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। চারদিকে শুধু এক কথা। মতিমাস্টার দেবতা। পাকড়াশী দাদু যাদু জানে।

মা আর আম্মাজানের খাটুনিও অনেক কমে গেছে। লঙ্গরখানা বন্ধ। শুধু দুবেলা ঘাঁটিগুলোর জন্য রান্না হয়। সে কাজ আর কতক্ষণের। তারপর নিজেদের খাওয়া দাওয়া শেষ করে দুজনেই শুধু ঘর বার করেন। আর পথের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ঐ বুঝি ওরা এল!

নায়েবখুড়ো দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর কিছুক্ষণ বসে হুঁকো

টানেন। তারপর চটি ফট্‌ফট্‌ করতে করতে চলে যান স্কুল বাড়ির দিকে। যেখানে নতুন সরকারের আপিস বসেছে। সেখানে তিনি সারাদিন নানান লোকের নালিশ আর্জি শুনে তার মিটমাট করেন। তিনি নতুন সরকারের জজ ম্যাজিস্ট্রেট। মতিস্যার তাঁকে এ কাজের ভার দিয়েছেন। সে কাজ মিটলে তিনি বৃদ্ধ ভট্টাচার্যি মশাইএর সঙ্গে বসে ধান চালের হিসাব করেন। কার কত দরকার কাকে কত দিতে হবে।

॥ নয় ॥

সারা চাকলার সবাই তখন ভাবতে শুরু করে দিয়েছে, এতদিন যখন কেটে গেল তখন আর কোন গোলমাল হবে না। ইংরেজ সরকার তার যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত। এদিকে মাথা ঘামানোর তার আর সময় নেই। এ দেশ স্বাধীনই হয়ে গেল। সবাই যে যার আপন কাজকর্ম নিয়ে আবার আগের মতন চলতে লাগল।

শুধু ঘুম নেই মতিমাস্টারের আর প্রফেসর পাকড়াশীর। আর তাদের সৈন্য সামন্তদের। প্রফেসর পাকড়াশী স্পষ্ট করে সবাইকে বলে দিয়েছেন। একদিন এক মিনিটের জন্যও ঘাঁটি ছাড়া চলবে না। গ্রামের কামারশালায় রাতদিন কাজ চলেছে। দেশী বন্দুক তৈরি শুরু হয়েছে। তীর, বল্লম, খাঁড়া, তলোয়ার সব কিছু। প্রফেসরের বাড়িতে চলেছে বোমা তৈরি। বাইরে থেকে আসছে মাল মসলা। বারুদ। তিনি বলেছেন যুদ্ধ হবেই। আর সে যুদ্ধে হারা চলবে না।

ঠিক সতের দিনের মাথায় খবর এল স্থলেমানের কাছ থেকে। মামুদপুরের ষ্টেশনে বাইরে থেকে অনেক বন্দুকধারী পুলিশ এসেছে। চাকলার ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও এসে তাঁবু ফেলেছেন। আর এসেছে পুলিসের বড় বড় সব অফিসাররা। স্টেশনের মাঠে তাঁবুর সহর বসে গেছে। সেখানেই রোজ পয়সার কুলির কাজ নিয়েছে স্থলেমান সঠিক খবর পাবার আশায়। আরও দুদিন পরে খবর এল আগামী কাল বড়পোল আর ছোটপোলের দিকে পুলিসবাহিনী এগোবে। পাকা রাস্তাটা ওরা আগে দখল করতে চায়।

এ খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রফেসর পাকড়াশী তাঁর দল বল নিয়ে ছোটপোলের পাশ ছেড়ে পিছিয়ে গেলেন বড়পোলের ধার পর্যন্ত। বড়পোলের পাশ থেকে শুরু করে, গজার জঙ্গল পর্যন্ত সমস্ত জায়গাটা

জুড়ে ছড়িয়ে দিলেন তাঁর দল বল। যতগুলো বন্দুক সম্ভব যোগাড় করে বিলিয়ে দিলেন তাঁর দলের লোকদের মধ্যে। হুকুম দিলেন বাড়তি লোকদের আশেপাশেই হাজির থাকার। তীর ধনুক লাঠি বল্লম সড়কি, আর বোমা, বোতলবোমা নিয়ে তৈরি হয়ে বসল তাঁর দলের লোকরা।

পরদিন খুব ভোরেই মাঠ ঘাট জুড়ে এগিয়ে এল পুলিসবাহিনী। বেশ খানিকটা এগিয়ে এসে থামল তারা। সেখান থেকেই মুখে চোঙ্ লাগিয়ে তাদের অনেকেই চেঁচাতে লাগল—তোমাদের আর মাত্র এক ঘন্টা সময় দেওয়া হল। তারপরেই আমরা এগবো! যারা বাধা দেবে তাদের উপরে গুলি চালানো হবে। কারও কোন ক্ষতি করতে চায় না সরকার, তাই তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে বলা হচ্ছে!

—তোমরা ঘরে ফিরে গেলে সরকার কোনো রকম শাস্তি কাউকেই দেবে না। কোন রকম ধরপাকড়ও হবে না। তোমরা ফিরে যাও। না ফিরে গেলে তোমরা যারা ধরা পড়বে সরকার তাদের কঠিন শাস্তি দেবে। তোমরা ফিরে যাও।

কেউ ফিরে গেল না। ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে, ধান ক্ষেতের আলের আড়ালে বসে সবাই ভীষণ যুদ্ধের জন্য তৈরী হল। সময় যেন আর কাটতে চায় না। এক ঘন্টা যে এত বেশি সময় তা কে জানত!

প্রফেসর পাকড়াশী এরই মধ্যে ডেকে পাঠালেন শোভানকে আর অমলকে। শান্ত গলায় বললেন—তোমরা ফিরে যাও তোমাদের দলের কাছে। গজার জঙ্গলের ভিতরে জায়গায় জায়গায় ঘাঁটি গাড়বে। গজার জঙ্গল থেকে শুরু করে পদ্মবাওর পর্যন্ত সব জায়গাটা সামলাবে। কনকপুরের দলকে ডেকে পাঠিয়ে কাজে লাগাবে। লোক পাঠিয়ে (ক) ঘাঁটিকে বলবে, তারা যেন পদ্মবাওরের ধার থেকে শুরু করে নদীর তীর পর্যন্ত সমস্ত জায়গাটার ভার নেয়। দেরি না করে যত তাড়াতাড়ি পার ঘাঁটিতে ফিরে কাজে লেগে যাবে তোমরা।

হুকুম শুনে আর দাঁড়াল না ওরা। পিছনে পড়ে রইল বড়পোলের যুদ্ধ ক্ষেত্র। কি যে হবে সেখানে তা ওরা জানল না। তবে এটুকু জানল গজার জঙ্গল আর পদ্মবাওরের মাঝখান দিয়ে কাউকেই ভিতরে ঢুকতে দেওয়া চলবে না। কিছুদূর এগিয়েই অমল বলল--এ কোন দিকে চলেছিস তুই শোভান?

—আয় আমার সঙ্গে। বলল শোভান—আমরা গজার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাব। তাতে অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছাবো ঘাঁটিতে।

গভীর জঙ্গলের মধ্যে যখন ওরা ঢুকে পড়ছে তখনি হঠাৎ পিছন থেকে আওয়াজ উঠল এক সঙ্গে—দুম দুম দুম। বুম। বুম। বুম। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে বড়পোলের ধারে। এক মিনিটও থামল না ওরা। পিছন দিকে ফিরেও তাকাল না। গভীর জঙ্গল থেকে আরও গভীর জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলল। দুপুর বেলা নাগাদ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির হল ঘাঁটিতে। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে বড়পোলের ধারে। এখানেও সবাই তৈরী হয়ে নাও।

বাকি বেলাটুকু অমল আর শোভান এক মিনিটের জন্যও বসতে পেল না। গজার জঙ্গল থেকে পদ্মবাওরের ধার পর্যন্ত ছুটে বেড়াতে লাগল। জায়গা ঠিক করে ঘাঁটি বসাতে লাগল। কার কি কাজ, কোন সংকেতে কি করতে হবে। কতটা এগোনো যাবে ঘাঁটি ছেড়ে দরকার পড়লে, কতটাই বা পিছবে এই সবই তারা ঘাঁটিদারদের বোঝাল।

লোক পাঠিয়েছিল আগেই। খবর পেয়ে কনকপুরের দলও এসে পড়ল সন্ধ্যে নাগাদ। নতুন অস্ত্র নতুন লোক সব ছড়িয়ে দিয়ে মনের মতন করে যুদ্ধের জায়গা আগলে বসল সেনাপতি শোভান।

রাতের অন্ধকারে খবর বয়ে নিয়ে এল রসিক দাস—আনন্দ কর সবাই। আনন্দ কর। বড়পোলের যুদ্ধে আমরা জিতেছি।

সারাদিন ভীষণ কাণ্ডের পর বিকেল নাগাদ পুলিশবাহিনী পিছু হটে গেছে। ছটা আরও নতুন বন্দুক আমাদের হাতে এসেছে। আরও গুলি বারুদ!

অমল বলল—আমরাও জিতব ঠিক ঐ ভাবেই, তোমরা দেখো।

শোভান বলল—একটা কথা চুপিচুপি বলবে রসিক দাদা।

—কি কথা?

—আমাদের দলের কারও চোট লাগেনি?

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল রসিক। তারপর বলল—হ্যাঁ ভাই। মরেছে নজন। ষোল জনের আঘাত লেগেছে খুব। তাদের চিকিচ্ছে হচ্ছে।

—এসব দেখে ভয় পায়নি কেউ।

—না। স্পষ্ট করে বলল রসিক দাস—সবাই পিতিজ্ঞে করেছে মরব, তবু পিছু হটব না। সবাই মরদ ওরা, ভাই।

পরদিন ভোর বেলাতেই খবর পাঠাল সুলেমান। পুলিশবাহিনী ফিরে গেছে মামুদপুরে। ওদের মরেছে অনেক, অনেকে আহত। এমন যে হবে তা ওরা ভাবতেই পারে নি।

যুদ্ধে হারার খবর যখন এলো, রাত্রিবেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সে কি চেঁচামেচি! তবে একথাও ঠিক, হঠাৎ এখন আর কোনোদিকের সঠিক খবর না নিয়ে, এগোবে না পুলিশবাহিনী।

আরও দুটো থমথমে দিন কাটল। আহতদের মধ্যে আরও তিনজন মারা গেলো। অন্যদের অবস্থাও ভাল নয়। সুলেমানের কাছ থেকে কোনো খবর আসাও হঠাৎ যেন বন্ধ হয়ে গেল। পুলিশ-বাহিনীরও কোনো খবর নেই। মার খেয়ে তবে কি তারা দেশ ছেড়ে পালাল? সবাই ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বড়পোলের ধার থেকে শুরু করে বাওরের ধার পর্যন্ত দলের সবাই চনমন করতে লাগল। আবার কখন যুদ্ধ শুরু হবে তার জন্য।

তৃতীয় দিন দুপুরে সুলেমান নিজেই এল খবর দিতে প্রফেসরের

কাছে। সর্বনাশ, মামুদপুর ইষ্টিশনে একটা টেরেন এসে দাঁড়িয়েছে। তাতে বোঝাই লালমুখো সব সাহেব। সঙ্গে করে বন্দুক তো তারা এনেছেই, আরও এনেছে কেমন ধরনের ছোট ছোট সব এঁকাবেঁকা বন্দুক। তেঠ্যাঙ্গা খাটো খাটো চোঙ্গা মাটিতে রাখলে তেরছা ভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। আর লম্বা লাউয়ের মতন সব লোহার বোমা। কেমন করে অত বড় জিনিসটাকে ছোঁড়ে, তা কেউ জানে না।

এখবর শুনে প্রফেসর পাকড়াশী মাটির দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন—আমাদের দলের সবার কাছে খবর পৌঁছে দাও। বোমা পড়ে মাটিতে যেখানে গর্ত হবে, দরকার পড়লে তার মধ্যে লাফিয়ে পড়ে, যেন গুলির হাত থেকে সকলে বাঁচে। এটা বাঁচার উপায়। এতে লজ্জার কিছুই নেই।

সুলেমান ফিরে গেল মামুদপুরে।

সব ঘাঁটিতেই এ খবর পৌঁছে দেওয়া হল। সেদিন আর কোনো দিকে কোনো গোলমাল হল না। বেলা পড়ে এল।

বিকেল নাগাদ সামনের ঘাঁটি থেকে লোক এসে খবর দিল দক্ষিণে গজার জঙ্গলের উপর দিয়ে, মামুদপুরের দিক থেকে, ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। সমস্ত আকাশ কালো হয়ে গেছে। ব্যাপার কি? অবাক হয়ে সকলেই আকাশের দিকে তাকাল। তখুনি সকলের কানে ভেসে এল অদ্ভুত সব শব্দ—বুম বুবুম্ বুম বুম বুম! তবে কি নতুন কোনো জায়গায় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে প্রফেসর পাকড়াশীর দলের সঙ্গে।

সবাইকেই হুঁশিয়ার করে দিল শোভান। যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ এসে যেতে পারে। কিন্তু আওয়াজটা এক টানা কিছুক্ষণ হয়ে থেমে গেল। আকাশের কোণের কালো ধোঁয়াও যেন হঠাৎ শূন্যে মিলিয়ে গেল। কিছু ভাল করে বোঝবার আগেই চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। সবাই হুঁশিয়ার, রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে কেউ যেন ভিতরে আসতে না পারে।

কিন্তু কেউ আর এল না সে রাতে। সেই অদ্ভুত আওয়াজ থামার পর, চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেছিল। তেমনি নিস্তব্ধতার মধ্যেই রাত কেটে গেল। অনেক বেলায় খবর পৌঁছল শোভানের কাছে। গত রাতে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে প্রফেসার পাকড়াশী নিজেই তার দলবল নিয়ে গেছিলেন মামুদপুরের ষ্টেশনে। চার দিক থেকে ঘিরে বোতল বোমা মেরে পুরো পুলিস ঘাঁটিকে তাঁরা জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছেন। ট্রেনটার কথাও তাঁরা ভোলেন নি। সেটাকেও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঐ শব্দ আর ধোঁয়া তারই।

তাঁর দলের তিরিশ জন গেছিল এ কাজে। ফিরেছে মাত্র এগারো জন। বাকিদের যে কি হয়েছে কেউ জানে না। সুলেমান ফিরে না আসা পর্যন্ত সে খবর জানা যাবে না। প্রফেসর নিজে অবশ্য ফিরে এসেছেন। তবে তিনিও অল্প আহত হয়েছেন। প্রফেসর জানিয়েছেন, এ একটা বিরাট জয়। তবে তার জন্য কোনও ঘাঁটির কোথাও এতটুকু ঢিলে দেওয়া চলবে না। সবাইকে সব সময়ে তৈরি থাকতে হবে। এসব খবর শুনে সবাই খুব খুশি হল। কিন্তু মনও খারাপ হল, যারা আর ফেরেনি তাদের কথা ভেবে।

আরও দুটো দিন কেটে গেল। সুলেমানের দেখা নেই। প্রফেসরের হঠাৎ আক্রমণের ফলে সেও কি তবে আঘাত পেয়েছে! প্রফেসর রসিক দাসকে হুকুম দিলেন মামুদপুরে যাবার জন্য। সঠিক খবর নিয়ে সে যেন সে রাতেই ফেরে।

সে রাতেই সুলেমান এল। রাত তখন অনেক। সে এলো সোজা শোভানের কাছে। সারা বুকে পিঠে তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সে ব্যাণ্ডেজে রক্তের দাগ।

সারা পথ বোধ হয় সে ছুটে এসেছে। হাঁপাচ্ছে তাই। বলল— আমার চোট লেগেছে খুব। তাই আসতে পারিনি এত দিন। কিন্তু আজ না এসে থাকতে পারলাম না। তোমরা সবাই তৈরি হও।

আক্রমণ এসে পড়ল বলে। দেশী সেপাই নয়। সব লালমুখো। অনেক অস্ত্র তাদের।

শোভান ব্যস্ত হয়ে বলল—প্রফেসরের কাছে খবর দিয়েছ ?

—রসিক গেছে সে দিকে। অতটা পথ আমি যেতে পারব না, তাই আমি এসেছি এদিকে। ভাই আজ ভীষণ যুদ্ধ। জেতো যদি, মান থাকবে। হারলে আল্লা জানে। বুকের ব্যাণ্ডেজ তখন ওর রক্তে জবজবে হয়ে উঠেছে।

শোভান বলল—তোমার এখানে থাকা চলবে না চাচা, তুমি কনকপুরে চলে যাও। সেখানে গিয়ে বিশ্রাম নেবে ভাল না হওয়া পর্যন্ত। আর সেখান থেকে আরও লোক পাঠাবে। অনেক অনেক। হারা আমাদের চলবে না।

সুলেমান বলল—হ্যাঁ, আমি তাই যাচ্ছি। পারলে বুড়ো পাকড়াশী মশায়ের সঙ্গেও দেখা করব। আল্লা তোমাদের সবার ভাল করবেন।

শোভান আরও দুজন লোক দিল ওর সঙ্গে। ওরা চলে গেল কনকপুরের দিকে। ওরা চলে যেতেই শোভান আর অমল ঘাঁটি থেকে ঘাঁটি ছুটে গিয়ে সবাইকেই সজাগ করে দিল। হুঁশিয়ার, এবারে এদিকে আক্রমণ আসছে।

ঠিক কাক ডাকা ভোরে আক্রমণ শুরু হল। সামনে যতদূর দেখা যায়, কোথাও কোন মানুষ নেই। আকাশ থেকে শুধু বৃষ্টির মতন বড় বড় লোহার গোলা এসে মাটিতে পড়তে শুরু করল। বুম বুম বুম, মাটি ছিটকে বড় বড় গর্ত হয়ে গেল চারদিকে। বুম বুম বুম! কোনো দিকে কোনো লোক নেই! আকাশ থেকে আগুন নামছে যেন বৃষ্টির মতন! কিছু বোঝার আগেই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে মানুষগুলো। কোথাও কেউ নেই, যুদ্ধ কার সঙ্গে ? আকাশ আগুন পাতাল আগুন হয়ে গিয়েছে! মর মর শুধু মর সবাই! কেমন যেন ঘাবড়ে গেল সকলে। দু একজন ভয় পেয়ে আড়াল

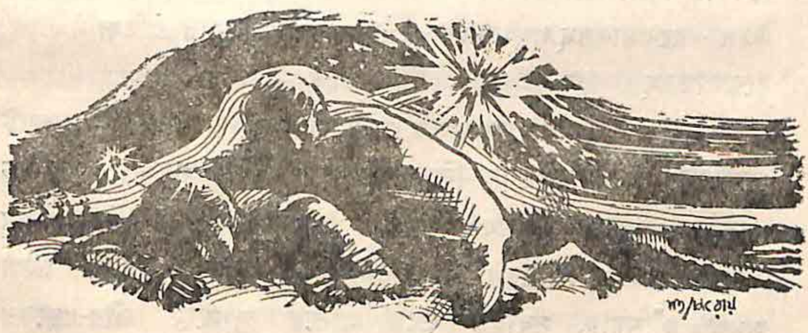
ছেড়ে ছুটে পালাতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দূরে আওয়াজ উঠল টা টা টা। হুমড়ি খেয়ে ছিটকে পড়ে গেল লোকগুলো। বুম বুম বুম।

অমল চেঁচিয়ে উঠল—সর্বনাশ হয়েছে রে শোভান। সবাই ভয় পেয়েছে। এমন চললে, সবাই পালাবে।

—হামাগুড়ি দিয়ে তুই এগিয়ে যা ডানদিকে। সবাইকে বল গর্তের মধ্যে লাফিয়ে পড়তে, আমি যাচ্ছি বাঁদিকে। যে পালাতে চেষ্টা করবে, সে কিন্তু মরবে। দেখছিস না মাটি ঘেঁসে গুলি চালাচ্ছে ওরা। যা তুই, দেরি করিস না। বুকে হেঁটে এগিয়ে গেল ওরা দুজন দুদিকে।

—গড়িয়ে পড় গর্তের ভিতরে। গড়িয়ে পড়। কেউ যেন উঠে দাঁড়িয়ো না। তাহলেই মরবে। বুকে হেঁটে গড়িয়ে পড় গর্তে। কোনো ভয় নেই। মাথার উপর দিয়ে গুলি চলে যাবে। সবাই পড় গর্তে। বুম বুম বুম। কোথায় যেন কে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। কে যেন যন্ত্রণায় কাতরাতে শুরু করল। সামনের একজন বলল—আমি বাড়ি যাব। আমার ভয় করছে।

নিজের শরীর দিয়ে অমল তাকে চেপে ধরল মাটির সঙ্গে।



—কোনো ভয় নেই। কোনো ভয় নেই। এগিয়ে চল সামনের গর্তটার দিকে। ওতে পড়তে পারলেই তুমি বাঁচবে। চল চল।

বুম বুম বুম। টা টা টা। বুম বুম বুম। সে আওয়াজ থামতেই অমল চেঁচিয়ে উঠল—ভয় পেয়েছো তোমরা? বলতে তোমাদের লজ্জা করে না? দেবেশ ভয় পায়নি। আর তোমরা ভয়ে কাঁদছ? বড়-পোলের যুদ্ধে যারা মরেছে তারা মরেছে হাসিমুখে। তোমরা কাঁদছ? কাঁদ তোমরা। তোমরা কাপুরুষ। মতিমাস্টার মিথ্যে তোমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন। প্রফেসর পাকড়াশী মিথ্যে তোমাদের জন্য যুদ্ধ করছেন বুড়ো বয়সে। তোমরা পার শুধু কাঁদতে। মরতে তোমাদের বড় ভয়। কাঁদ, বসে বসে তোমরা কাঁদ। কিন্তু মনে রেখ ইংরাজরা তাহলেও তোমাদের ছাড়বে না। দেখলে না যারা পালাতে গেল, তারা কেমন গুলি খেয়ে মরল। মরতে চাও তোমরা? পালাও। বাঁচতে চাও তো তোমরা লড়। লড়ে মরবে যে তার জন্য সারাদেশ কাঁদবে!

বুম বুম বুম। টা টা টা। ওর চিৎকার সেই শব্দের মধ্যে মিলিয়ে গেল। কিন্তু অবাক হয়ে অমল দেখল কেউ আর লাফিয়ে উঠে পালাতে গেল না। সবাই গড়িয়ে গিয়ে আশ পাশের গর্তগুলোতে পড়ল। কান্নাও হঠাৎ থেমে গেল। যন্ত্রণায় যে কাৎরাচ্ছিল তার চিৎকার বন্ধ হয়ে গেল। কোথায় কে যেন প্রাণপণে চীৎকার করে উঠল—বন্দেমাতরম্। এপাশ ওপাশ চারদিকে তার প্রতিধ্বনি উঠল, বন্দেমাতরম্। বুম বুম বুম। টা টা টা।

হঠাৎ আচমকা সব আওয়াজ থেমে গেল। ব্যাপার কি? একটু মাথা উঁচু করে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল অমল। দূরে বড় আলটার ওপারে কি যেন নড়ছে। কোনো সন্দেহ নেই ওরা এগিয়ে আসছে! ওরা আসছে! মাথা নিচু করে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল অমল—হুঁশিয়ার, সবাই। ওরা আসছে আসছে, তীর-ধনুকের পাল্লার মধ্যে ওরা এসে পড়লেই তীর চালাবে। বোমা রেডি কর।

বোতল বোমায় আগুন জ্বালো। বন্দুক, আমাদের বন্দুক কোথায় ? সবাই সাবধান।

ঠিক অমনি করে আরও অনেকে চেঁচিয়ে উঠল। সবাই দেখেছে সবাই তৈরি। এই যুদ্ধের জন্যই তো ওরা এতদিন ধরে ঘাঁটি পেতে বসে আছে। আসুক ওরা কাছে। আকাশে আগুন, পাতালে আগুন জ্বালিয়ে দেবার মজা বুঝিয়ে ছাড়বে এবারে এরা।

চেঁচাল অমল—গর্ত ছেড়ে কেউ বাইরে বার হবে না, সাবধান।

সাঁই সাঁই। সাঁই সাঁই সাঁই। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটল। তার পরেই দম দমাদম হাতবোমা। হুইস্ হুইস্, জ্বলন্ত বোতল বোমা। এগো এগো, আরও কত এগোবি তোরা, আয় এগিয়ে আয়। সাঁই সাঁই সাঁই। সাঁই সাঁই সাঁই। হুইস হুইস। ওদিক থেকে ওরাও উত্তর দিল, টা টা টা, কলের বন্দুক চালিয়ে। চট করে সকলে মাথা নীচু করল। ও শব্দ চেনা হয়ে গেছে। ওতে আর ভয় পায় না কেউ।

বীর দর্পে এগোচ্ছিল ওরা হঠাৎ থমকে গেল।

—থামো থামো। আর কিছু করতে হবে না। চেঁচাল অমল —আগে এগোক ওরা, তারপর আবার যুদ্ধ চলবে। পিছোলেই থামবে।

হঠাৎ মনে হল অমলের শোভানের দল করছে কি ?

ওদিক থেকে তো কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না ! কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। না বোঝা যাক। এদিকের যুদ্ধ এখন অমল বুঝেছে। মানুষগুলোর মনের ভয় আর নেই। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে ও, সবার মুখে যেন কেমন কঠিন ভাব। হাতের তীর ধনুক আর বোমাগুলোর দিকে বারবার ওরা তাকিয়ে দেখছে। তারপর ঘৃণাভরা চোখ তুলে তাকাচ্ছে দূরের লালমুখোগুলোর দিকে। একটু থমকে গেছিল দূরের লোকগুলো। সে কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওদের হাতের এঁকা বেঁকা নতুন বন্দুকগুলো। হঠাৎ আচমকা আবার সে বন্দুক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালাতে

শুরু করে দিল ওরা। টা টা টা টা। সাঁই সাঁই করে মাটি ঘেঁসে ছুটে চলল গুলিগুলো। তেমন ভাবে সমানে গুলি চালিয়ে ওরা এগোতে শুরু করে দিল।

সর্বনাশ, ভাবল অমল। মাথা তুলতে না পারলে তীর চালানো যাবে কেমন করে? কেমন করে বোমা ছোঁড়া যাবে? ওর দলের বন্দুকওয়ালারা গুলি চালাচ্ছে না কেন? হঠাৎ মনে পড়ল ওর, ওর দিকে তো বন্দুকওয়ালারা নেই। সবাই তো শোভানের দিকে।

তাহলে উপায়? না, হারা চলবে না। মরিয়া হয়ে ও গর্তের ভিতর থেকেই প্রাণপণে বোমা ছুঁড়তে শুরু করে দিল। দম দম দম। বুঝতে পারল ও, ওর দেখাদেখি অন্যেরাও তাই করতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু এমন করে কি ওদের ঠেকান যাবে? এসে পড়ল বলে ওরা! আর বড় জোর দু মিনিট, তার পরেই হাতাহাতি লড়াই শুরু হবে।

হোক তাই হোক, যতক্ষণ বোমা আছে হাতে, ততক্ষণ তাই ছুঁড়বে ও তারপর কাটারী হাতে লাফিয়ে পড়বে লালমুখোদের মাঝখানে। হাতাহাতি লড়ে মরবে। প্রাণপণে বোমা ছুঁড়তে লাগল অমল। এসে পড়ল বলে ওরা, লাফিয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলতে যাচ্ছিল অমল, এমন সময় হঠাৎ বাঁদিক থেকে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে নতুন শব্দ উঠল দুম দুম দুম—সাঁই সাঁই সাঁই। হুইস্ হুইস্ হুইস্।

স্পষ্ট শুনতে পেল অমল, ওদিক থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল—ও গড, ও গড, ইট্স্ এ হেল। উই আর আউট ফ্ল্যাঙ্কড্। গেট ব্যাক। গেট ব্যাক, কুইক্। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর তার সঙ্গে বোমা আর বোতল বোমা এসে পড়তে লাগলো লালমুখোদের মাঝখানে।

এক ঘেয়ে টা টা আওয়াজটাও যেন হঠাৎ থেমে গেল। ভারি পায়ে ছোটার আওয়াজ শোনা গেল। সাহস করে মাথা তুলে দেখল অমল। প্রাণের ভয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে লালমুখোগুলো।

—বন্দেমাতরম্—বন্দেমাতরম্।

তারপর যা হল তা কিন্তু ভাবতে পারে নি অমল। দেখল গর্ত ছেড়ে লাফিয়ে উঠেছে শোভান! ছটা বন্দুক থেকে সমানে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা লালমুখোদের উপরে।

—বন্দেমাতরম্। চেঁচিয়ে উঠল অমল—চল এগোও এগোও। নইলে শোভানের বিপদ হবে। চল চল। এগোও সকলে। বন্দেমাতরম্ —বন্দেমাতরম্।

কোনো দিকে কারও কোনো খেয়াল ছিল না। মুহূর্তে হাতের অস্ত্র ফেলে, সাহেবগুলো মাথার উপরে হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল।

জয় জয় জয়! আমাদের জয় হয়েছে। ছুটে এসে শোভান জড়িয়ে ধরল অমলকে—আমাদের মুখ রেখেছিস ভাই। অমন করে রুখে না দাঁড়ালে এ জয় আমাদের হত না।

একজন সাহেব বলল—আমাদের মেরো না তোমরা।

—না, মানুষ মারা আমাদের কাজ নয়। দেখে যাও তোমরা আমাদের কজনকে মেরেছো, শুধু আমরা স্বাধীনতা চাই বলে। বলল শোভান।

—আমরা হুকুমের চাকর। আমাদের মাপ কর।

—সে আমি জানি না। মাপ করা বা শাস্তি দেবার ভার আমাদের সরকারের। এখন তোমরা আমাদের বন্দী। বন্দীদের সবার হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলা হল। শোভানের হুকুমে সবাই আবার ঘাঁটি আগলে বসল। আহতদের সবাইকে যত্ন করে তুলে নিয়ে আসা হল। লালমুখো কি স্বদেশী সে বিচার করা হল না। মরেছে যারা তাদেরও সরিয়ে নেওয়া হল।

সাহেবদের হাতের অদ্ভুত সব অস্ত্রগুলো এক জায়গায় যত্ন করে জড়ো করা হল। এ অস্ত্রগুলোর ব্যবহার শেখা চাই যত শিগগির সম্ভব। সাহেবদের ঝোলা থেকে বার হল সব শক্ত শক্ত লোহার বোমা, আংটা লাগানো, এ দিয়েই কি ওরা আকাশে পাতালে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল? কে জানে, প্রফেসর না এলে কোনো কিছুই বোঝা যাবে না।

এদিকে ওদের নিজেদের বোমার যোগানও প্রায় ফুরিয়েছে। বোতল বোমাও প্রায় খতম। বন্দুকের গুলি যা আছে তাতে অবশ্য চলবে কিছুক্ষণ। কিন্তু শুধু তীর ধনুক, ঐ অস্ত্র ক'টা আর বন্দুক দিয়ে কি আবার একটা আক্রমণ ঠেকানো যাবে? বোধ হয় না! লোক ছুটল গজার জঙ্গল ভেদ করে প্রফেসরের কাছে। এখুনি তার আসা চাই। নইলে বিপদ হবে।

দুপুর নাগাদ কনকপুরের দল নতুন কিছু অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে ঘাঁটির ভার নিল। একটু ছুটি পেয়ে শোভান আর অমল বসল বন্দীদের নিয়ে। অস্ত্রগুলোর ব্যবহার শিখে নিতে পারলে ভাল হয়। ওদের আর যে কি মতলব আছে, তাও জানতে পারলে সব দিক থেকে ভাল।

ওদের দুজনের মুখে ইংরেজী শুনে বন্দীরা অবাক। একজন বলল—আমাদের বলা হয়েছিল কতকগুলো অসভ্য জংলী দেশের সর্বনাশ করছে। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু আমরা তো দেখছি তোমরা সবাই ভদ্র, শিক্ষিত। এ কেমন হল?

শোভান বলল—সব ভারতীয়রাই আমাদের মতো। আমরা স্বাধীনতা চাই বলেই তোমাদের গভর্ণমেণ্টের কাছে আমরা অসভ্য, জংলী।

লোকগুলো লজ্জা পেল। কিন্তু স্পষ্ট করে বলল, ওদের মেরে ফেললেও ওরা কোনো অস্ত্রের ব্যবহার শিখিয়ে দেবে না, বা বলবে না, এর পরে কি করা হবে।

॥ দশ ॥

অনেক চেষ্টা করল ওরা দুজনে। কিন্তু কোনোই ফল হল না। কোনো কথারই জবাব ওরা দেবে না। নিরুপায় ওরা নতুন বন্দুকগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখল। না অসম্ভব, এর ব্যবহার না জানলে, এ দিয়ে কোনো কাজই হবে না। প্রফেসরের জন্য বসে থাকা ছাড়া কোনো উপায় নেই। কনকপুর থেকে, যারা খাবার পৌঁছে দিল তাদের কাছেও অন্য কোনো দিকের কোনো খবর পাওয়া গেল না। লোকগুলো যাবার সময়ে আহতদের সঙ্গে করে নিয়ে গেল।

সন্ধ্যে নাগাদ গজার জঙ্গল থেকে বার হলেন প্রফেসর। তাঁরও দেহের নানান জায়গায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছেন তিনি। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত অবস্থাটা বুঝে নিলেন। লোহার বোমাগুলো দেখে বললেন—এগুলো হ্যাণ্ডগ্রেনেড্। আংটা খুলে কিছুক্ষণ হাতে ধরে রেখে, তবে ছুঁড়তে হবে। ভাল করে গ্রেনেড ছোঁড়ার কায়দাটা উনি সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন। আঁকাবাঁকা বন্দুক দেখে বললেন—এগুলো যুদ্ধের ষ্টেনগান। বন্দুকের কলকব্জা একবার ভাল করে দেখে নিয়ে, শক্ত হাতে একটা বন্দুক ধরে, সামনের দিকে মুখ করে, তার ঘোড়া টিপে দিলেন। টা টা টা, মুহূর্তে বন্দুক থেকে গুলি ছুটতে লাগল। তখুনি সবাইকে ওর ব্যবহার শেখাতে বসে গেলেন তিনি। যারা বন্দুক ছুঁড়তে পারে তারাই পেল ষ্টেনগানগুলো। কেমন করে গুলির ক্যাপটা বদল করতে হবে তাও বুঝে নিল সকলে। গজার জঙ্গল থেকে পদ্মবাওরের ধার পর্যন্ত কিছু দূর দূর তারা বন্দুক নিয়ে বসে গেল।

ওর সঙ্গে যারা এসেছিল তারা তাদের থলি উজার করে নতুন বোমা ঢেলে দিয়ে গেল।

—আরও পাবে তোমরা—বললেন প্রফেসর—কিন্তু মনে রাখবে এবারে যুদ্ধের কায়দা বদল করতে হবে। ঘাঁটি আগলে আড়ালে বসে থাকবে তোমরা, শত্রু একেবারে হাতের কাছে এসে না পড়লে, একটাও অস্ত্র চালাবে না। তা তীরই হক, বা বোমাই হক। ষ্টেনগান চলবে সবার শেষে। যদি দেখ তীর বা দেশী বন্দুক বোমায় ঠেকাতে পারছে না তখন চলবে ষ্টেনগান।

বার বার একথা বললেন প্রফেসর তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—কেউ কি বাড়ি ফিরে যেতে চাও। যারা চাও তারা যেন কোনোরকম লজ্জা না করে আমাকে বলো। তাদের আমি ছেড়ে দেবো। কেউই অবশ্য একথা বলতে এগিয়ে এল না। তখন যুদ্ধের জায়গার চারপাশ ঘুরে ঘুরে ভাল করে জায়গাটা দেখলেন তিনি। বললেন—গর্তগুলো হ্যাণ্ড-গ্রেনেডে হয় নি। ও গর্তগুলো মর্টারের গোলার গর্ত। তার মানে শত্রু বেশী দূরে নেই। আবার তারা অল্প কিছুক্ষণ পরেই আক্রমণ শুরু করবে। আড়াল ছেড়ে বা গর্তের বাইরে আসতে সকলকে বারণ করলেন তিনি।

শোভান বলল—যদি রাত্রিবেলা আক্রমণ আসে তবে তো অন্ধকারের জন্য ভীষণ অসুবিধা হবে।

প্রফেসর উত্তর দিলেন—ভুলে যাচ্ছিস তুই। অসুবিধা যেমন তোর, তাদেরও তেমনি। আর এ জায়গাটা ওদের অচেনা। এখানে ওরা রাতের বেলা আক্রমণ করে নিজেদের বিপদ ডেকে আনবে না বলেই মনে হয়। যাই হোক সাবধানের মার নেই। তোরা তৈরি থাকিস।

আর বেশীক্ষণ বসলেন না উনি। ওদিকে ওঁর ঘাঁটিতে যে কি হচ্ছে কে জানে। সঙ্গীদের নিয়ে অত রাতেই গজার জঙ্গলের মধ্যে ফের ঢুকে পড়লেন প্রফেসর।

ঠিক ভোরেই আবার আক্রমণ এল। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ওরা এগোল! চেঁচিয়ে শোভান বলল—মনে আছে ভাই

সকলের। ওরা নাগালের মধ্যে না এলে কেউ যেন কোন মতেই বন্দুকে আওয়াজ তোলে না।

সকলের সে কথা মনে ছিল। গর্তে, আলের আড়ালে আর ঝোপে ঝাড়ে সবাই নিঃশব্দে বসে রইল। ওরা আসছে। আরও এগিয়ে এল। আরও, আরও। ওদের বন্দুকের গুলি আশে পাশে, মাথার উপর দিয়ে, সাঁই সাঁই করে ছুটে যাচ্ছে। তবুও কেউ ভয় পেল না। কেউ একটাও আওয়াজ তুলল না।

ব্যাস। এসে গিয়েছে ওরা নাগালের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে অমল চেঁচিয়ে উঠল—চালাও তীর। তীর চলল। নতুন বন্দুক থেকে গুলি ছুটল। যারা খুব কাছে এসে পড়েছিল তাদের উপরে পড়ল বোমা, হ্যাণ্ডগ্রেনেড, সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলো পিছিয়ে গেল।

ওরা ভাবেনি ওদের হাতের অস্ত্র এত তাড়াতাড়ি এরা চালাতে পারবে। আধ ঘন্টা বড় জোর। তার মধ্যেই যুদ্ধ থেমে গেল। ওরা পালাল।

কেউ এবারে আর আনন্দে চেঁচাল না। কেউ জায়গা ছেড়ে নড়ল না। শোভানের হুকুম ছিল তাই। এবারে ওদের পক্ষের কারও তেমন কিছু চোট লাগেনি। অন্য পক্ষের যারা আহত হয়েছিল, তাদের ওরাই তুলে নিয়ে গেল। সে কাজে এরা বাধা দিল না।

আবার আক্রমণ আসবে সে কথা ভেবেই ওরা তৈরি হয়ে বসে রইল। আক্রমণ কিন্তু এল না!

ঘন্টা খানেক বাদে ওরা অবাক হয়ে দেখল। সেই সেদিনকার মতো আজও, দূরের আকাশে কুণ্ডলি পাকিয়ে ধোঁয়া উঠতে শুরু করেছে। সে ধোঁয়া আসছে দক্ষিণের ছোট কালিকাপুরের দিক থেকে। ব্যাপার যে কি, কেউ বুঝতে পারল না।

অমল জিজ্ঞাসা করল—ছোট কালিকাপুরেই কি আগুন লেগেছে?

—তাইত মনে হচ্ছে। বলল শোভান।

—আমরা ওখানে যেতে পারলে কাজ হত।

—না, আমরা ঘাটি ছেড়ে কোথাও যাব না।

অনেকক্ষণ ধরে কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁয়া উঠে সারা আকাশ কালো করে দিল।

—সারা গাঁয়েই আগুন লেগেছে রে! বলল শোভান।

—ইস্! কত লোকের যে সর্বনাশ হল।

—ও কথা ভেবে আর কি হবে। আমরা তো কিছুই করতে পারব না।

আস্তে আস্তে ধোঁয়া কমে গেল। ওরা বেশ বুঝতে পারল সমস্ত গ্রামটাকে জ্বালিয়ে তবেই ও আগুন থেমেছে।

আগুন নেবার আধ ঘণ্টা পরেই সামনের ঘাঁটির পাহারা চেঁচিয়ে উঠল—শোভান. দলে দলে লোক আসছে এদিকে। বহু লোক!

—কারা আসছে। ইংরেজ?

—না। মনে হচ্ছে ছোট কালিকাপুরের লোকেরা। সবার সঙ্গে জিনিসপত্র। ছেলে মেয়ে বাচ্চা বুড়ো সবাই আসছে। ওদের কি ঢুকতে দেব?

—না না। শোভান চেঁচিয়ে উঠল—ওদের ফিরে যেতে বল।

অমল বলল—সে কি রে শোভান? ওরা ফিরে যাবে কোথায়? ওদের গ্রাম তো জ্বলে গেছে।

—তা হোক, ওরা ফিরে যাক। যেখানে হোক। আমার ভাল লাগছে না রে অমল।

—কেন, কি হল? ওরা না হয় আমাদের পেরিয়ে চলে যাক কনকপুরে। সেখানে আমাদের সরকার ওদের দেখবে।

—কিন্তু ওদের গ্রাম জ্বালাল কারা? শোভান জিজ্ঞাসা করল।
—আমার মনে হয় ওদের এগিয়ে দিয়ে পিছনে ইংরেজগুলো আসছে। তা হলে আমরা লড়ব কেমন করে? গুলি চালালে তো মরবে ওরাই আগে।

সামনের ঘাঁটির পাহারা চেঁচিয়ে উঠল—শোভান, সর্বনাশ

হয়েছে! সার বেঁধে ইংরেজরা আসছে ওদের পিছনে। আমরা কি করব? ওরা বাঁক পার হয়েই এসে পড়বে আমাদের সামনে। —না না। চেঁচিয়ে বলল শোভান—আয় অমল আমার সঙ্গে। বলে এগোল ও সামনের দিকে।

সামনে এগিয়েই দেখতে পেল, যা ভেবেছে তাই। গ্রামের লোক-গুলোর পিছনেই ইংরেজ সৈন্য। একটু কি যেন ভাবল শোভান। বলল—অমল, তুই সব ঘাঁটিতেই ছুটে ছুটে গিয়ে বল। গ্রামের লোকদের বাঁচিয়েই লড়তে হবে। ওরা পার হয়ে গেলেই গুলি চলবে। যদি ইংরেজরা গ্রামের লোকদের সঙ্গে মিশে যায়, তবে গর্ত ছেড়ে উঠে, হাতাহাতি লড়াই করতে হবে। প্রত্যেক ঘাঁটি তার বুদ্ধি মতো কাজ করবে। বিপদ হলে সবাই পিছিয়ে গিয়ে গজার জঙ্গলে ঢুকবে। তুই যা অমল দেরি করিস না। সবাই যেন খবর পায়। অমল যাবার আগেই আবার শোভান ডাকল—শোন অমল।

—কি রে?

—আমাকে মনে রাখবি তো?

—তার মানে?

—না এমনি বললাম। যা তুই, যা ভাই।

ছুটল অমল। সব ঘাঁটির সবাই শুনল হুকুম। কারও মুখের কোনোও ভাব বদল হল না। কিন্তু অমল টের পেল সবাই বেশ বুঝতে পেরেছে কী ভীষণ যুদ্ধ সামনে।

সামনে থেকে শোভানের চিৎকার শোনা গেল—ছোট কালিকাপুরের সবাই শোন। তাড়াতাড়ি তোমরা এই ভাঙ্গা রাস্তাটা পার হয়ে যাবে। সোজা থামবে গিয়ে কনকপুরে। সেখানে তোমাদের দেখার লোক আছে। তোমরা তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাও জায়গাটা।

কিন্তু তা হল না। ভাঙ্গা জায়গার কাছেই ইংরেজ সৈন্যগুলো জোর কদমে এসে মিশে গেল ওদের সঙ্গে। তারপর যুদ্ধ শুরু হল।

কেউ আড়াল খুঁজল না। কেউ মরার ভয়ে পিছিয়ে গেল না! হাতাহাতি যুদ্ধ বেধে গেল। কিন্তু এ অসম্ভব যুদ্ধ। ইংরেজদের বন্দুকের গুলি কোনো কিছুই বিচার করে চলছে না। ছোট কালিকাপুরের বাচ্চা শিশুরাও ওদের দয়া পেল না! বুড়োরা মেয়েরাও না। টা টা টা, ওদের বন্দুকের গুলি সমানে আগুন ঢেলে চলল।

—পিছোও জঙ্গলের দিকে পিছোও। শোভানের গলা শোনা গেলো—ওদের দিকে মুখ রেখে পিছোও।

সবাই যেন তাই চাইছিল। চোখে দেখা যায় না বাচ্চা শিশুদের খুন! আস্তে আস্তে ওরা পিছোতে লাগল। হাতের বন্দুকের গুঁতোয় সামনের একটা ইংরেজের মুখ থেতলে দিল অমল। লোকটা এখুনি একটা মেয়েকে গুলি করে মেরেছে। তার পরেই এক লাফেও পিছিয়ে গেল খানিকটা। ওর হাতের বন্দুকের গুলি ফুরিয়েছে। থাকলেও তা ও ছুড়তো কেমন করে? কার গায়ে লাগত সে গুলি? কোনো কিছুই ভাবার সময় নেই। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে হবে। ঢুকতে পারলেই বাঁচতে পারবে। বাঁচলেই আবার লড়তে পারবে।

একবার মুখ ঘুরিয়ে পিছনে দেখল অমল। ঝোপগুলো আর কত দূরে। স্টেনগানের এক ঘেয়ে টা টা টা শব্দের সঙ্গে বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ মিশে সমস্ত জায়গাটা নরক হয়ে উঠেছে! এ আওয়াজ শোনার থেকে মরে যাওয়া ভাল। তবুও একটা চিন্তাই ওর মাথায়, পিছোও পিছোও। ঢোকো জঙ্গলে। হুকুম যে তাই!

একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল অমল, হঠাৎ হুস ফিরে আসতেই দেখলো সামনেই একটা গোরা বন্দুক ওঠাচ্ছে। তাকে আর ঠেকান যাবে না!

লাফিয়ে এক পাশে সরে যেতে চাইল ও। তার আগেই একটানা আওয়াজ উঠল,—টা টা টা। কে যেন পাশ থেকে ছুটে এসে ওকে ধাক্কা দিল। একটা ঝোপের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ল অমল! গোরার হাতের

বন্দুকে শব্দ উঠল টা টা। না, কোনো আঘাত লাগেনি ওর। পরক্ষণেই অন্য দিকে শব্দ উঠল টা টা টা! মাথা নিচু করল অমল।

গোরাটা ওকেই লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু কি হল তার, যে ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে বাঁচালো!

টা টা টা—আবারও আওয়াজ উঠলো। কিন্তু কই আশ পাশ দিয়ে তো কোনো গুলি ছুটে গেল না! পায়ের কাছে কে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল একটু দূরে। তার হাত থেকে ছিটকে পড়ল একটা স্টেনগান। ওটা চালাবার কায়দাটা মনে মনে ঠিক করে নিয়েই বন্দুকটা হাতে তুলে অমল লাফিয়ে সামনে এগিয়েই থমকে দাঁড়াল! সামনেই পড়ে রয়েছে শোভান! তার কিছু দূরেই ইংরেজটা। রক্তে শোভানের জামা কাপড় লাল!

—জঙ্গলে পালা অমল। জঙ্গলে। আমার হুকুম। বাঁচলে আবার লড়াই হবে।

—তুই আমার জন্য মরলি শোভান? চেঁচিয়ে উঠল অমল। এ তুই কি করলি?

—হুকুম শোন। সবাইকে নিয়ে জঙ্গলে ঢোক। জঙ্গলে,··· ঘড় ঘড় করে গলা দিয়ে আওয়াজ উঠে শেষ কথাগুলো অস্পষ্ট হয়ে গেল ওর। মাথাটা হেলে গেল এক দিকে। তারপরেই সব শেষ!

টা টা টা। চারদিকে তখনও গুলির শব্দ। আরও বীভৎস ভাবে গুলি চালাচ্ছে ইংরেজরা। কাউকেই ওরা বাঁচতে দেবে না। এক ঝটকায় নিজেকে তুলে দাঁড় করাল অমল। কান্না নয়! দুঃখ নয়! ব্যথা নয়! কোনো কিছুই নয়। চোখের জলও নয়। শোভান, শোভান ভাই!

চেঁচিয়ে উঠল অমল—জঙ্গলের দিকে চলো সবাই। জঙ্গলের দিকে। এখুনি। শিগ্‌গির।

জঙ্গলের ভিতরে অনেক দূর পর্যন্ত ইংরেজগুলো ওদের তাড়া করে এল। থামল যখন, তখন ক্লান্তিতে ওদের শরীর ভেঙ্গে

পড়েছে। কারও মুখে কোনো কথা নেই। বলার মতন কোনো কথাও ওদের ছিল না। ওরা মাত্র পঁচিশ জন ফিরেছে। বাকি যারা, তারা সবাই শোভানের মতো এখানে ওখানে শুয়ে রয়েছে। আর কোনো দিনও তারা লড়াই করবে না। একটা জায়গায় ওরা বসে পড়ল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল মাটিতে। অনেকক্ষণ কারও মুখে কথা নেই। অনেক বাদে কে যেন বলল, —এখন আমরা করব কি।

—প্রফেসরের সঙ্গে যোগ দেব। প্রতিশোধ নিতে হবে আমাদের। কঠিন স্বরে বলল অমল।

—এখনও সে সাহস আছে!

—মরতে আর ভয় পাই না। আমরা সবাই শোভান।

—চল তবে চল। দেরী করে লাভ নেই।

বেশি দূর যেতে হল না ওদের। জঙ্গলের মধ্যেই দেখা হল প্রফেসরের দলের সঙ্গে। সে দলে প্রফেসর নেই। ইংরেজরা বড়পোলের কাছে কলের কামান এনেছে। সে কামানের মুখে ওদের দলের সবাই ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে গেছে। বৃদ্ধ প্রফেসর বীরের মত লড়ে মরেছেন।

দুদিন ওরা বসে রইল জঙ্গলে। লোক পাঠাল হেমন্তপুরগঞ্জের দিকে, সে লোকের সঙ্গে ফিরলেন মতিমাস্টার আর তাঁর দলের কজন লোক। সে যুদ্ধেও হেরে গেছে স্বদেশী সরকার। নদী দিয়ে বড় বড় ষ্টিমার করে দলে দলে সৈন্য নামিয়ে ছিল ইংরেজ সরকার গঞ্জের আশে পাশে চার পাঁচ জায়গায়। তারা ঢুকে পড়েছে ভিতরে। (ক) ঘাঁটির লোকদের মেরে সাফ্ করে দিয়েছে। (ঘ) ঘাঁটিতে মতিমাস্টার লড়েছেন। কিন্তু সে লড়াইয়ে ওঁর দলের লোকরাই মরেছে শুধু। সারা দেশ আবার দখল করে নিয়েছে ইংরেজ সরকার।

যুদ্ধ শেষ। ভীষণ যুদ্ধ শেষ। মতিমাস্টার শেষ বারের মতন

হুকুম দিলেন, পালাবার। জঙ্গলের একটা জায়গায় গর্ত খুঁড়ে সব অস্ত্র ওরা পরনের জামা কাপড় জড়িয়ে পুঁতে রাখল। যদি ফের কোনো সুদিন আসে। ছেঁড়া কাপড় পরে ভিখিরী সেজে বার হয়ে পড়ল ওরা, এক এক দিকে। কলকাতায় কালিঘাটের মন্দিরের সামনে দশ বারোদিন বাদে মিলবে সবাই। তারপর আবার ঠিক করবে ওদের ভবিষ্যতের প্ল্যান।

দুদিন বাদেই ধরা পড়ল অমল। অল্প কদিনেই ধরা পড়ল অন্য অনেকে।

কোর্টে যেদিন বিচার উঠল, সারা শহর ভেঙ্গে পড়ল কোর্টে। অবাক হয়ে অমল দেখল, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মতিমাস্টার। দেবেশের বাবা। নায়েবখুড়ো। সুলেমান চাচা আর ওর মা আর আম্মাজান। আরও অনেকে!

সব কথায় ওরা উত্তর দিল—বন্দেমাতরম্।

অনেক চেষ্টা করলেন সারা দেশের অনেক বড় বড় উকিল মোক্তার। ফাঁসির হুকুম হল মতিমাস্টারের। অমলের বয়স কম বলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। আর সকলের নানা রকমের সাজা।

জেলে বসেই লেখাপড়া শিখল অমল। জেলেই মারা গেলেন মা।

তারপর হঠাৎ দেশ স্বাধীন হয়ে গেল। ছাড়া পেল অমল। বি এ-তে ভাল ফল করে, বিদেশে পড়তে যাবার সুযোগ পেয়ে গেল ও। চলে গেল আমেরিকা।

তারপর কত কি ঘটে গেছে ওর জীবনে। হু হু করে ছাব্বিশটা বছর কেটে গেছে।

এখন ও বড় লোক। চৌধুরী বাড়ির কৃতী ছেলে। নানা কাজে সারাক্ষণ ব্যস্ত। এতটুকুও সময় নেই নষ্ট করার। দেশের বাড়ির এখন ও একলা মালিক। মনে ইচ্ছা, মা আর আম্মাজানের নামে একটা কিছু করে সেই বাড়িতে। তাই একটু সময় করে এসেছে দেশে।

বুড়ো সুলেমান বলল—এই সেই বাওর বাপজান। মনে পড়ে এখানের যুদ্ধুর কথা?

—হ্যাঁ, মনে পড়ে। উত্তর দিল অমল।

মনে পড়ে আরও কত লোকের কথা, দেবেশ, শোভান, প্রফেসর পাকড়াশী আর মতিস্যারের কথা। মনে পড়ে মা আর আম্মাজানের কথা। মনে পড়ে আরও কত কি!

সে তো আজ বহুদিন হয়ে গিয়েছে।

সুলেমান বুড়ো হাঁকল—আমরা এসে গিইচি বাপজান। আর পোয়াটাক পথ এগোলেই চৌধুরীদের দুগ্‌গো বাড়ি দেখতে পাবে। আমরা এসে গিইচি!

আবার কনকপুর গ্রামে এসে পৌঁছাল অমল।

॥ শেষ ॥